[সাহিত্য-সম্রাট্ চার্লস্ ডিকেন্সের অমর গ্রন্থ]

বীরভদ্র অনূদিত

নাথ ব্রাদার্স

২৩-সি, ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স
২৩-সি, ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৪৪

এক টাকা

প্রিণ্টার
নাথ ব্রাদ
৬, চালতা

প

হা

র

নিবিড় ভাবে তার কপালের ওপর নিজের বিবর্ণ পাংশু ঠোঁটছুটো চেপে ধরলে, তারপর তার মুখখানিকে ছু' হাত দিয়ে তুলে ধরে একদৃষ্টে তাকালে, এবং ঐ ভাবে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে বার ছুই কেঁপে উঠে সে ধীরে ধীরে বিছানার উপর নেতিয়ে পড়ে গেল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি তার বুক-হাত সমস্ত পরীক্ষা করলে, কিন্তু রক্ত চলাচল একেবারে চিরকালের জন্যে বন্ধ হ'য়ে গেছে।

সব শেষ—সে বলে উঠল—সব শেষ হয়ে গেছে।

বুড়ী নার্স্ ছেলেটিকে তুলে নিয়ে মন্তব্য করলে—আহা! বেচারা।

ডাক্তার এবার তার দস্তানা পরতে পরতে বললে—ছেলে টা যদি কাঁদে ত আমাকে আর ডেকে পাঠাবার দরকার নেই। ও একটু ঝঞ্ঝাট্ করবেই, তখন একটু পানীয় মুখে ফেলে দিও। তারপর টুপিটা তুলে নিয়ে যেতে গিয়ে বিছানার ধারে একটু থেমে জানালে —যুবতীটিকে দেখে ত বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের বলে' মনে হচ্ছে কোত্থেকে ও এল ?

বুড়ী জবাব দিলে—ওভার-সিয়ারের আদেশে ওকে কাল রাত্তিরে আনা হয়েছে, রাস্তার ধারে ও পড়ে ছিল। ও যে বেশ খানিকটা হেঁটে এসেছে তা' ওর জুতোর অবস্থা দেখেই বোঝা যায় ; কিন্তু কোত্থেকেই বা এসেছে, আর কোথায়ই বা যাচ্ছিল তা' কেউ জানে না।

ডাক্তার চলে গেল, বুড়ীও নিজের কাজে মন দিলে।

যতক্ষণ অলিভার একটা কম্বলে ঢাকা ছিল, লোকের পক্ষে চেনা

কঠিন ছিল সে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে কি ভিক্ষুকের সন্তান। কিন্তু এবার তাকে অনাথ আশ্রমের ব্যাজ পরিয়ে যথাস্থানে রাখা হ'ল। এখন থেকে অনাথ আশ্রমের সে একজন মাতাপিতৃহীন বালক, নীচ, অধম শিশু, জগৎ তাকে দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠবে, সকলেই করবে অবজ্ঞা, কেউ আর করুণা দেখাবে না!

সে কাঁদতে লাগল। যদি সে জানত যে পৃথিবীতে সে একজন অনাথ, গীর্জ্জার কর্ম্মচারীদের করুণার ওপরই তাকে নির্ভর করতে হ'বে, তাহ'লে সে হয়ত আরও জোরে ডুকরে কেঁদে উঠত।

—দুই—

বেচারী অলিভার ! এই দীর্ঘ আট দশ মাস ধরে ওর ওপর যেন প্রতিনিয়ত শঠতা ও নৃশংসতার আক্রমণ চলেছে! আঙুল চুষে চুষেই ও মানুষ হচ্ছে। অনাথ আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ সহরের কর্ত্তৃপক্ষকে এই অনাথ বালকের ক্ষুধার্ত্ত ও অসহায় অবস্থার কথা বলেছিল, সহরের কর্ত্তৃপক্ষ জান্‌তে চাইলে যে ঐ স্তন্য-পোষ্য দুধের শিশুটিকে যোগ্যপানীয় যোগাতে পারে এমন কোন স্ত্রীলোক ঐ আশ্রমে আছে কিনা। উত্তর পাওয়া গেল যে না, নেই। এতে সহরের কর্ত্তৃপক্ষ দয়া-পরবশ হ'য়ে ঠিক করলেন যে অলিভারকে তিন মাইল দূরবর্ত্তী আর একটা অনাথ আশ্রমে পাঠানো হ'বে, সেখানে তারই মত বিশ ত্রিশটি শিশু ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে মানুষ হয়। সেখানে একজন বুড়ী আছে, তার জিম্মায়ই সবাই থাকে, আর সে প্রত্যেক মাথা পিছু সপ্তাহে সাড়ে সাত পেন্স্‌ করে পেয়ে থাকে। সপ্তাহে সাড়ে সাত পেন্স্‌ একটা শিশুর আহারের পক্ষে যথেষ্ট। এই সাড়ে সাত পেন্সে এমন অনেক কিছু কেনা যায় যাতে শিশুর পেট ভর্ত্তি হয়ে উদ্বৃত্ত থাকবারই কথা, কিন্তু ঐ বুড়ী ছিল ভয়ানক ধড়িবাজ ; শিশুদের কিসে ভাল হবে, না হ'বে সে জ্ঞান ছিল তার টন্‌টনে। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে তার দৃষ্টি ছিল একেবারে নিখুঁত। তাই ...ীর ভাগটাই সে নিজে আত্মসাৎ করত, শিশুদের ববাতে কিছুই

প্রায় জুট্‌ত না। দুর্ভাগ্যক্রমে যে বুড়ীর জিম্মায় অলিভার এসে পড়্‌ল তার কাছে প্রতি দশটা ছেলের মধ্যে আটটা ছেলে হয় আগুনে পুড়ে মরত, না হয় রোগে ভুগে মরত।

বেশী বাড়াবাড়ি ঘটলে হয় ত গ্রামবাসীরা উত্তেজনার বশে প্রতিবাদ পাঠাত, কিন্তু সে সমস্ত মোটেই গ্রাহ্য হত না, কেন না, বুড়ীর হয়ে ডাক্তার সাক্ষ্য দিত, সাক্ষ্য দিত গীর্জ্জার কর্ম্মচারী। মিথ্যে কথাই তারা হাজার বার শপথ করে বলত। তা'-ছাড়া পরিদর্শকেরা যখন ঐ বুড়ীর কাজ পরিদর্শনে আসতেন তখন অনুগ্রহ করে তাঁরা আগে খবর পাঠাতেন, ফলে তাঁদের আগমনের দিনটিতে শিশুরা সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত। কাজেই লোকেদের আর বিশেষ কিছু বলবার থাকত না!

এই রকম যখন ব্যবস্থা, তখন সামান্য একটা বীজ থেকে যে একেবারে একটা ঝাড় ফলবে এ আশা করা একেবারে বাতুলতা। তাই অলিভার টুইষ্টের নবম জন্মদিনে তাকে দেখা গেল একটি বিবর্ণ, কৃশ শিশুরূপে, আকারে ছোট্ট, ঘেরেও বেশী বড় নয়। কিন্তু প্রকৃতি তার বুকের মধ্যে এক অমিত তেজ পূরে দিয়েছিল, অনাহারের দরুণ পরিপুষ্টি যত কমই হোক না কেন, এর বাড়বার সম্ভাবনা ছিল, ছিল আকাঙ্ক্ষা। যাই হোক্ এটা হচ্ছে তার নবম জন্মদিন, এবং সে এটা পালন করছে কয়লা ঘরে আরও দু'টি ছেলের সঙ্গে আটক থেকে, তাদের অপরাধ অতিশয় গুরু [illegible]র তারা তাদের ক্ষুধার কথা জানিয়েছে। এমন সময় বুড়ী বাগা[illegible] ফটকের ধারে গীর্জ্জার কর্ম্মচারী মিষ্টার বাম্বল্‌কে দেখে [illegible]

উঠল। মুখে বললে—কী সৌভাগ্য, আপনি কি মিষ্টার বাম্বল্? তারপর নিম্নস্বরে কাকে উদ্দেশ করে জানালে—সুসান্, অলিভার আর ঐ দুটোকে তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে গিয়ে ধুইয়ে দে।

কিন্তু বাম্বল্ মশাই হচ্ছেন একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা লোক এবং প্রকৃতিটাও তাঁর কিছু উদ্ধত। তাই বুড়ীর ঐ কথার জবাবে তিনি ফটকটা ধরে নাড়া দিলেন আর দরজায় একটা লাথি কষালেন।

এতক্ষণে বুড়ী বেরিয়ে এল, (কেন না, ঐ তিনটে ছেলেকে তখন সরানো হয়ে গেছে), বললে—কিছু মনে করবেন না, ছেলে-গুলোর ঐ ঝঞ্ঝাটে আমি ফটক খুলে রাখতে ভুলেই গেছি। আসুন —আসুন।

অন্য কেউ হলে হয়ত বুড়ীর এই মিষ্টি কথায় সন্তুষ্ট ˮ ˜ বাম্বল্‌মশাই ত্যু হলেন না। তাঁর ছড়িগাছটা এক—হেঁ-হেঁ, তা হ'বে বললেন—কোন কর্ম্মচারী, যে সরকারী ... অলিভার এখন বড় হয়েছে, এসেছে, তুমি কি মনে হচ্ছে যে সে এখন ওই আশ্রমে গিয়ে থাকবে। ˜রাখী। খুব ভদ্রতা? এসেছি। কোথায় সে?

বেতনভুক্ পরিচারিকা ˮ এখনি আনছি—বলে বুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে

বুড়ী আবার বিন্নর গায়ের জামায় তখন কালি লেগেছিল, তাকে যে ...াই আ...ধুইয়ে মুছিয়ে হাজির করা হ'ল।

বুড়ী বললে—ঐ ভদ্রলোকটিকে নমস্কার কর অলিভার।

সে নমস্কার করলে বটে, কিন্তু তা চেয়ারে উপবিষ্ট বাম্বল্‌মশাই ও টেবিলের ওপর টুপিটার মাঝখানের স্থানটিকে উদ্দেশ করে।

হোম্বল্‌মশাই এবার গম্ভীরভাবে জিগেস করলেন—তুমি কি কবে সঙ্গে যেতে চাও অলিভার ?

কিলিভার বলতে যাচ্ছিল যে, যে কোন লোকের সঙ্গেই সে প্রস্তুত আছে, কিন্তু ওপর দিকে চোখ পড়তেই সে অন্য হয়ে গেল। বুড়ী তখন চেয়ারের পেছন থেকে তাকে ঘুসী ফোঁটশাসাচ্ছে। সে এ ইঙ্গিত গ্রহণ করলে, কারণ ঐ ঘুসী পিঠে অনেক বার পড়েছে। বললে—উনিও কি আমার করবেন ?

না, উনি যেতে পারেন না। কিন্তু উনি মাঝে মাঝে এসে বাছা দেখে যাবেন।

কিন্তু এতে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল না। হাজার হোক্ সে ছোট শিশু, কাকেও ছেড়ে যেতে তার দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। চোখে জল এসে পড়াও কিছু বিচিত্র নয়, কেন না, ক্ষিদে এবং নির্য্যাতন দুইই চোখে জল আন্‌তে বেশ সাহায্য করে। তাই অলিভার কেঁদে ফেললে। বুড়ী তাকে তাড়াতাড়ি খুব আদর করতে লাগল, এমন কি একখানা রুটি ও মাখন খেতে দিলে যাতে না অনাথ আশ্রমে পৌঁছে তার খিদে পায়। তারপরে টুপি পরিয়ে বাম্বল্‌মশাই তাকে সেখান থেকে নিয়ে চললো—সেই ভয়ঙ্কর বাড়ী যেখানে সে বাল্যের এই ক'টা বছরে একটিও দয়ার কথা কিংবা কৃপাদৃষ্টি লাভ করেনি। তবুও যখন কুটিরের দরজা তার পেছনে বন্ধ হ'য়ে গল সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঠিক শিশুর মতই কেঁদে উঠল। যে হতভাগ্য সঙ্গীর দলকে সে পেছনে ফেলে যাচ্ছে,

এতদিন তারাই তার একমাত্র বন্ধু ছিল, এবং এই প্রথম সে তাদের ত্যাগ করে এই বিরাট পৃথিবীতে কেমন যেন একটা নিঃসঙ্গতা বোধ করলে।

বাম্বল্‌মশাই খুব জোরে জোরেই চলছিলেন, অলিভার অতিকষ্টে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে যেতে প্রত্যেক মাইল-ষ্টোনের কাছে জিগেস করছিল এবার তারা এসে পড়েছে কিনা। এর জবাব তিনি সংক্ষেপে দিচ্ছিলেন।

পনের মিনিটের মধ্যে তাঁরা অনাথ আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন, অলিভারের তখন আর এক টুকরো রুটি খাওয়া শেষ হয়েছে। বাম্বল্‌মশাই একবার ভেতরে ঘুরে এসে অলিভারকে বললেন যে, এই রাত্রে বোর্ডের মিটিং বসেছে এবং তাকে সেখানে হাজির হ'তে হ'বে। বোর্ড বলতে কি বোঝায় অলিভার তা বুঝতে না পেরে এ সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গেল, এবং সে হাসবে না কাঁদবে তা ঠিক করে উঠতে পারলে না। যাই হোক্ আর ভাববার সময় নেই, কেন না, বাম্বল্‌মশাই তার মাথায় একটা বেতের টোকা মেরে তাকে সজাগ করে দিলেন, আর এক ঘা পিঠে দিয়ে তাকে চকিত করলেন। তারপর তাকে একটা চূণকাম-করা ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে আট-দশজন মোটা ভদ্রলোক বসেছিলেন।

বাম্বল্‌মশাই বললেন—বোর্ডকে প্রণাম জানাও।

অলিভার কোন 'বোর্ড' দেখতে না পেয়ে, সামনে টেবিলটাকে দেখে সেটাকেই প্রণাম করলে। হাত দিয়ে তখন সে চোখের জল সামলাচ্ছে।

সবচেয়ে মোটা ভদ্রলোকটি শুধোলেন—তোমার নাম কি হে খোকা?

অলিভার এতগুলো মোটা-সোটা লোক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে কাঁপছিল, তার ওপর বাম্বল্‌মশাই পেছন থেকে আর এক ঘা কষালেন। এই দুই কারণে তার মুখ দিয়ে খুব আস্তে জবাব বেরুল, তাতে শাদা-ওয়েষ্ট্‌কোট-পরা একজন ভদ্রলোক বললেন যে এটা আস্ত বোকা।

উঁচু চেয়ারে উপবিষ্ট পূর্ব্ব ভদ্রলোকটি আবার বলে উঠলেন—ওহে খোকা, আমার কথা শোনো, তুমি জানো যে তুমি একজন অনাথ?

—সে জিনিষটা কি মশাই? বেচারী অলিভার জিগেস করলে।

সাদা-ওয়েষ্টকোট-পরা ভদ্রলোকটি আবার বলে উঠলেন—আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই, ওটা একেবারে আস্ত গাধা।

প্রথম ভদ্রলোকটি বললেন—থামুন। খোকা, তুমি জানো যে তোমার মা-বাপ্‌ কেউই নেই, তুমি এই অনাথ আশ্রম কর্ত্তৃক পালিত হয়েছ?

অলিভার কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলে—ইয়েস্‌ সার্‌।

সাদা-ওয়েষ্ট্‌কোট-পরা ভদ্রলোকটি আবার শুধোলেন—তুমি কাঁদছ কেন?

আর একজন ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় জিগেস করলেন—আমি আশা করি যে তুমি সত্য-কার খৃষ্টানের মত প্রতি রাত্রে যারা তোমায় খেতে দেয় তাদের জন্য প্রার্থনা কর ?

ছেলেটি ভেবড়ে উত্তর দিলে—ইয়েস্ সার্।

উঁচু চেয়ারে উপবিষ্ট পূর্ব্ব ভদ্রলোকটি বললেন—তুমি এখানে এসেছ শিক্ষিত হ'তে, তোমাকে কোন দরকারী ব্যবসা শেখানো হবে।

অলিভার এবার বাম্বল্‌মশাইকে নমস্কার করে ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আর একটা বড় ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে একটা শক্ত বিছানার ওপর সে ফোপাতে ফোঁপাতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারী অলিভার! সে মোটেই জানত না যে, সে যখন ঘুমে অচৈতন্য তখন বোর্ডের সভ্যরা তার সম্বন্ধে এমন একটা কিছু স্থির করেছে যাতে তার ভবিষ্যতে উপকার হ'বে।

বোর্ডের সভ্যরা সবাই ছিলেন সাধু, বিজ্ঞ এবং দার্শনিক ব্যক্তি। এই অনাথ আশ্রমের দিকে একবার তাঁদের নেকনজর পড়ল। এটা হচ্ছে গরীবদের আড্ডাখানা, তাদের সবাই এখানে ফাঁকি দিয়ে খেয়ে যায়। তাই তাঁরা বলে উঠলেন—উহুঁ, এ চলবে না! তার পরের দিন থেকেই জল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে তাঁরা প্রচুর জলের ব্যবস্থা করলেন এবং ধানের গোলার সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন যে মাঝে মাঝে তারা কিছু কিছু খাদ্য যোগাবে। এই রকম ব্যবস্থা করে তাঁরা নিয়ম করলেন যে দিনে তিনবার করে খুঁদ্-সিদ্ধ দেওয়া হ'বে, আর সপ্তাহে দুবার

পেঁয়াজ। তাঁদের মস্তিষ্ক থেকে এ রকম আরো অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যবস্থা বেরিয়ে এল,যার ফলে অনাথ আশ্রমের অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন কমতে লাগল। তাতে বোর্ডের আনন্দ আর ধরে না।

যে ঘরটায় ছেলেদের খাবার দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে একটা লম্বা হল্। একজন লোক আরও হু'জন সহকারিণী নিয়ে খাবার সময় ঐ খুঁদ্-সিদ্ধ বিলোন্। প্রত্যেকের এক ডিসের বেশী পাবার উপায় নেই, শুধু এক-একটা পর্ব্ব-দিনে এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। তখন তারা ও ছাড়াও একখানা করে আড়াই-আউন্স ওজনের রুটি পায়। ডিসগুলোকে কখনো ধোয়া হয় না, ছেলেরাই সেগুলোকে তাদের চামচে দিয়ে ঘসে ঘসে ঝক্ঝকে করে রাখে। যখন তারা এ রকম করে তখন তাদের এক দৃষ্টিতে ঐ হাঁড়ির দিকে চেয়ে থাকতে দেখা যায়, তাদের সে দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন তারা শক্ত ইট পেলেও তা হজম করে দিতে পারে। মাঝে মাঝে আঙুল চুষে তারা যেন জানাতে চায় যে তাদের মোটেই পেট ভরেনি। ছেলেদের সাধারণতঃ ক্ষুধাবোধটা একটু বেশী, অলিভার আর তার সঙ্গীর দল তিনমাস এই ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করলে, আর কি পারা যায়? একদিন একটা ছেলে, (যে এ রকম উপোসে অভ্যস্ত নয়, কেন না, তার বাপের খাবারের দোকান ছিল) তার সঙ্গীদের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলে যে তাকে যদি আর এক ডিস করে না

দেওয়া হয় ত' সে খিদের জ্বালায় তার পাশের ঐ ঘুমন্ত ছোট ছেলেটাকে একদিন রাত্রে বোধ হয় খেয়েই ফেলবে। তার কেমন একটা বুভুক্ষু বন্য দৃষ্টি ছিল, তাই সবাই সেটা বিশ্বাস করলে। তাই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ বসলো, লটারী করা হ'ল কে সেদিন সন্ধ্যায় খাবার দেওয়ার পর আরও বেশী চাইবে। অলিভারের ওপরই সেই ভার পড়ল।

সন্ধ্যা নেমেছে, ছেলেরা যে যার জায়গায় বসে। কর্ম্মচারী তার পাচকের পোষাক পরে হাজির, সঙ্গে তার সহকারিণীরা। হাঁড়ি আনা হল, খাবার দেওয়ার পর আবার সেটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কাণাঘুষা চালিয়েছে, অলিভারকে তারা একবার চোখের ইঙ্গিত করলে, তার পাশের সঙ্গী তাকে দিলে একটা ঠেলা। বেচারী! শিশু সে, খিদেয় সে জ্বলছিল, কষ্টে আত্মহারা। টেবিল থেকে সে উঠে দাঁড়ালো এবং কর্ম্মচারীর নিকট গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে—সার্, অনুগ্রহ করে আর একটু দিন।

কর্ম্মচারীটি ছিল একজন মোটা-সোটা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি, কিন্তু সেও যেন পাংশু মেরে গেল। কয়েক সেকেণ্ড সে অবাক্ হ'য়ে ক্ষুদ্র বিদ্রোহীটির পানে তাকিয়ে রইল। সহকারিণীরাও যেন এ ব্যাপারে একেবারে আড়ষ্ট মেরে গেছে, ছেলেরা ভয়ে গেছে সিঁটিয়ে।

অবশেষে কর্ম্মচারী হেঁকে উঠ্‌ল—কী বলছো?

অলিভার জবাব দিলে—অনুগ্রহ করে আর একটু দিন।

এবার কর্ম্মচারীটি অলিভারের মাথায় হাতার বাড়ি এক ঘা বসিয়ে বাম্বল্‌মশাইকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল।

বোর্ডের তখন মিটিং বসেছে। হঠাৎ বাম্বল ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে ভদ্রলোকদের সম্বোধন করে বললেন—মিষ্টার লিম্ব্‌কিন্‌স্‌, মাপ করবেন, অলিভার টুইষ্ট্ আরও বেশী চেয়েছে।

সবাই যেন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল, প্রত্যেকের মুখের ওপর কেমন যেন একটা ত্রস্ত ভাব।

লিম্ব্‌কিন্স বলে উঠলেন—এঁ্যাঃ, বল কি বাম্বল্‌,ওকে যা' দেওয়া হয় তারপরও ও আরও চেয়েছে? তুমি সত্যি বলছ ত?

—আজ্ঞে হাঁ।

সাদা-ওয়েষ্টকোট-পরা ভদ্রলোকটি এবার বললেন—ও ফাঁসী যাবে, আমি জানি ও একদিন ফাঁসী যাবে।

কেউই তাঁর কথার প্রতিবাদ করলে না। তৎক্ষণাৎ তুমুল আলোচনা চল্‌ল, এবং অলিভারকে নির্জ্জনে আটক রাখবার আদেশ দেওয়া হ'ল। শুধু তাই নয়, পরদিনই বাইরে এক বিজ্ঞাপন লট্‌কে দেওয়া হ'ল যে, যে অলিভারকে শিক্ষানবীশ হিসেবে গ্রহণ করবে তাকে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।

—তিন—

তারপর থেকে এক সপ্তাহ ধরে অলিভার নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ আছে। তার যদি ঐ সাদা-ওয়েষ্টকোট-পরা ভদ্রলোকটির ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকত তাহলে সে দেওয়ালের কে একখানা রুমাল আট্‌কে সেটা নিজের গলায় বেঁধে নিশ্চয়ই ঝুলে পড়ত। কিন্তু তা' হবার জো নেই। প্রথমতঃ বিলাসিতার জিনিস বলে রুমাল তাদের দেওয়া হয় না, দ্বিতীয়তঃ ছোট্ট ছেলে বলে সে খালি কাঁদতে লাগল, এবং রাত্রির অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় পেয়ে এক কোণে গিয়ে মুখে হাত দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নির্জ্জন ঘরে আবদ্ধ আছে বলে যে অলিভারকে কোন সুখ সুবিধে দেওয়া হ'ত না এমন নয়! প্রতিদিন সকালবেলা ঐ দারুণ শীতে তাকে বাইরে এসে বাম্বলের সামনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হ'ত, আর দেহকে শক্ত রাখবার জন্যে বেত খেতে হ'ত। সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্যে যে ঘরে ছেলেরা খায় তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রতি দুপুরে প্রহার দেওয়া হ'ত। আবার রাত্রিতে তাকে লাথি মার্‌তে-মার্‌তে ওরা ঐ নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে আটকে রেখে যেত। এত সুখ-সুবিধা সে ভোগ করত!

একদিন হ'ল কি চিম্‌নী-ঝাড়ুদার মিষ্টার গাম্‌ফিল্ড্ তার জমিদারের বক্রী খাজনা কি করে শোধ দেওয়া যায় তাই ভাবতে-

ভাবতে তার গাধাটাকে নিয়ে চলেছে। তার উর্ব্বর মস্তিষ্ক অনেক হিসেবপত্তর করেও কি করে যে পাঁচ পাউণ্ড বাঁচানো যায় তা' খুঁজে বার করতে পারছে না। এমন সময় তার দৃষ্টি ওই বিজ্ঞাপনটার ওপর গিয়ে পড়ল। সে লাফিয়ে উঠে গাধাটাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল—আরে হ'—হ'।

গাধাটা এ রকম অনভ্যস্ত জায়গায় থামবার কারণ কিছু বুঝতে না পেরে প্রভুর কথায় কাণ দিলে না। গাম্‌ফিল্ড এতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে নিরীহ পশুটাকে বেশ করে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিলে

সেই ওয়েষ্ট্‌কোট-পরা ভদ্রলোকটি ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন, গাম্‌ফিল্ড তাঁর কাছে গিয়ে জিগেস করলে —মশাই, ওই যে বিজ্ঞাপনে আছে একটি ছেলেকে শিক্ষানবিস দেওয়া হবে ওটার—

—হ্যাঁ, কেন ?

—আমার একজন শিক্ষানবিস দরকার তাই বলছিলাম।

—আচ্ছা ভেতরে এস।

তাঁরা দুজনে বোর্ডের কাছে গেলেন। গাম্‌ফিল্ড সেখানে তার ইচ্ছা পুনরায় ব্যক্ত করলে, লিম্ব্‌কিন্স বলে উঠলেন—চিমনী পরিষ্কার! ও বিশ্রী কাজ।

এর জবাবে গাম্‌ফিল্ড চিম্‌নী পরিষ্কার করার কাজের সপক্ষে যে সব হাস্যকর অদ্ভুত যুক্তি দেখালে তাতে সবাই হেসে উঠল। অবশেষে সভ্যরা নিজেদের মধ্যে আড়ালে আলোচনা করে এসে জানালে—না, তোমার প্রস্তাবে আমরা রাজী নই।

গামফিল্ড একবার আড়চোখে অলিভারের দিকে তাকালে

আপনারা আমায়, হুজুর, ঐ ছেলেটিকে শিক্ষানবিস

জবাব দিলেন—বিশ্রী কাজ, কিছু কম না নিলে

ম্‌ফিল্ডের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, সে বললে—তাহলে
দিচ্ছেন ? আমি গরীব মানুষ, আমায় মারবেন না।
উণ্ডই যথেষ্ট।

ার এক পাউণ্ড বাড়িয়ে আমায় চার পাউণ্ডই দিন।
নেক দর কষাকষির পর সাড়ে-তিন পাউণ্ডই স্থির
য়েষ্ট্‌কোট্-পরা ভদ্রলোকটি অলিভারকে দেখিয়ে
লন—নাও হে নাও। এই দেখ তোমার ছোকরা।
ার কাজেরই উপযুক্ত।

একবার আড় চোখে অলিভারের দিকে তাকালে।
পরের দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে ক্রেতা-বিক্রেতাকে
করিয়ে সব কাজ হাসিল হ'বে।

দিন অলিভারকে কয়েদ থেকে মুক্ত করে ফর্সা পোষাক
পরতে দেওয়া হ'ল, আবার তার খাদ্য ঠিক হ'ল আড়াই আউন্সি
রুটি আর ঝোল। এই সমস্ত দেখে শুনে, অলিভার আশ্চর্য্য
হ'য়ে ভাবলে যে নিশ্চয়ই বোর্ড তাকে ফাঁসী কাঠে ঝোলাবে ঠিক
।... নইলে তাকে হঠাৎ খাইয়ে দাইয়ে এরকম মোটা করবার
তে না। তাই সে ভয়ে কেঁদে উঠল।

বললেন—কেঁদে চোখ লাল কোরো না অলিভার।

তোমার বোর্ডকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কেননা, তাঁরা তোমার শিক্ষানবিসীর বন্দোবস্ত করেছেন।

বালক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শুধোলে—শিক্ষানবিসী!

—হ্যাঁ। বোর্ডের এতগুলি ভদ্রলোক যখন তোমার মা-ব আর তোমার নিজের যখন কেউ নেই; তখন এঁরাই তোমার এব ভবিষ্যৎ জীবনের হিল্লে করে দিলেন। এর জন্যে কত খরচ হ জান? সাড়ে-তিন পাউণ্ড,—সত্তর শিলিং,—আটশো চল্লিশ পেন

বাম্বল্ মশাইয়ের বক্তৃতা থামতেই অলিভারের গণ্ড বেয়ে ত ার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে ফোঁপাচ্ছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাবার পথে বাম্বল তাকে বেশ করে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিলেন। বললেন যে, সে যেন হাসি-হাসি মুখে থাকে, যেন বলে যে তার চিম্‌নী পরিষ্কারের কাজ বেশ ভাল লাগে। তারপর একবার ঘুসি বাগিয়ে তাকে ইঙ্গিত করে জানালেন যদি সে আদেশ পালন না করে ত' তার মাথা একেবারে গুঁড়ো করে দেবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করবার সময়টিতেও তিনি তাকে একটা চিম্‌টি কেটে বললেন যা বলেছি তা' যেন মনে থাকে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বসে আছেন, তাঁর পাশে আর একজন চশমা চোখে বুড়ো মতন ভদ্রলোক। এধারে লিম্ব্‌কিন্স্‌ ও গাম্‌ফি—ড্‌। বাম্বল সেখানে অলিভারকে হাজির করে বললে, এই সেই ছেলে হুজুর অলিভার, ওঁদের প্রণাম কর। এ-কথায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও ভদ্রলোকটি একবার তাকিয়ে দেখলেন।

অলিভার মাথা নুইয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কেন না সে ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথায় পাউডার দেখ্‌তে পেলে। সে কিছুতেই আর [illegible] করতে পারছিল না যে ম্যাজিষ্ট্রেটরা পাউডার মেখেই [illegible], না ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে তারপর পাউডার মাখে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবার জিগেস করলেন—ও নিশ্চয়ই চিম্‌নি [illegible]রের কাজ ভালবাসে?

—হ্যাঁ হুজুর। বাম্বল্‌ জবাব দিলে।

গাম্‌ফিল্‌ড্‌কে দেখিয়ে তিনি বললেন—এই লোকটাই না [illegible]কে চায়? দেখ বাছা, তুমি এর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার কোরো।

গাম্‌ফিল্‌ড্‌ জবাব দিলে—যখন আমি বলছি, তখন নিশ্চয়ই করব।

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-সাহেব তখন কাগজ সই করবার জন্যে হাত বাড়ালেন। সেই সময়টাই হ'ল অলিভারের ভাগ্যের একটা সঙ্কট মুহূর্ত্ত। কেন না, যদি তিনি কলমটা যে যায়গায় রেখেছিলেন সেখানেই পেতেন তাহলেই কাগজ-পত্তর সই হ'য়ে সব লেঠা চুকে যেত। কিন্তু তিনি তা পেলেন না, এধার ওধার খোঁজাখুজি করতে লাগলেন। আর ঠিক সেই সময়ই তাঁর দৃষ্টি বিবর্ণ পাংশু অলিভারের ওপর গিয়ে পড়ল। তিনি জিগেস করলেন—কি খোকা, তুমি অমন কালি মেরে গেছ কেন?

আর যায় কোথায়। এই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনে অলিভার এবার ভয়ে কেঁদে ফেললে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্-সাহেব বাম্বলের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে আবার জিগেস করলেন—খোকা, তোমার কী হয়েছে বল ত?

অলিভার এবার হাঁটু গেড়ে বসে ছ'হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমায় বরঞ্চ সেই অন্ধকার ঘরে পূরে রাখা হোক্, কিন্তু আমি ও-লোকটার কাছে যাব না।

বাম্বল্ এবার চেঁচিয়ে উঠলেন—বাবা, ঢের ঢের পাজী বদ্মাইস্ দেখেছি, কিন্তু অলিভার, তোর আর জোড়া মেলে না।

—তুমি চুপ্ কর। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ধমকে উঠলেন।

—আজ্ঞে আমায় বলছেন? বাম্বল্ জিগেস করলেন।

—হাঁ, তোমায়।

বাম্বল্ ত' একেবারে অবাক। গীর্জার কর্ম্মচারীকে ধমক! এ আবার কি, এ যে ভয়ানক পাপ!

ম্যাজিষ্ট্রেট্-সাহেব বলে উঠলেন—না, তোমরা ওকে অনাথ আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোরো। ওর কোথাও যাওয়া হবে না।

সেইদিন সন্ধ্যায়ই সেই ওয়েষ্ট্‌কোট-পরা ভদ্রলোকটি মন্তব্য করলেন—নাঃ, ও ছোঁড়া নিশ্চয়ই একদিন ফাঁসী যাবে।

পরের দিন প্রাতঃকালে জনসাধারণ আবার দেখলে যে অলিভারকে ভাড়া দেওয়ার জন্যে পুনরায় বিজ্ঞাপন ঝুলছে, যে কেউ ওকে নেবে, তাকেই দেওয়া হ'বে।

—চার—

বড় বড় পরিবারে এমন দেখা যায় যে যখন কোন বড় ছেলের কাজের জন্য কিছুই পাওয়া যায় না, তখন আত্মীয়-স্বজন বলে যে ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্, সেখানে একটা বোধহয় হিল্লে হ'য়ে যাবে। অনাথ আশ্রমের বোর্ডেরও ব্যবস্থা তাই হয়েছিল। অলিভারকে কোথাও গছিয়ে দিতে না পেরে তারা অনেক পরামর্শ করে ঠিক করলে যে অলিভারকে সমুদ্রের উপর জাহাজে কাজ করতে পাঠানো হ'বে। সেখানে চাই কি একদিন খালাসীরা তাকে মেরেও ফেলতে পারে। যেমন বজ্জাত ছোঁড়া, ও ওরই উপযুক্ত। বাম্বলের উপর ভার পড়ল এ সম্পর্কে নানান্ রকম খোঁজ খবর করবার। সেও অনুসন্ধান চালাতে লাগল।

একদিন এখন বাম্বলের সঙ্গে স্থানীয় শবাধার-প্রস্তুতকারক সোয়ারবেরীর দেখা। মৃত্যুহার, কাঠের দর, লাভ-লোকসান ইত্যাদি আলোচনার পর বাম্বল্ বললে—ভাল কথা মনে পড়েছে, আচ্ছা, তোমার সন্ধানে কি এমন কোন লোক আছে যে শিক্ষা-নবিস ছোকরা চায়!

শবাধার-মিস্ত্রী একটু ভেবে বললে—পাওনা কি রকম?

—তা' মন্দ নয়।

তাহলে আমারও ত' অনেক জিনিস লোক দিয়েই করাতে হয়, আমিই না হয় ছেলেটিকে নিতাম।

এই কথা শোনামাত্রই বাম্বল্ তার হাত ধরে আশ্রমের ভেতর নিয়ে এল। বোর্ডের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথাবার্ত্তার পর এই ঠিক হ'ল যে অলিভার আজ সন্ধ্যায়ই তার কাছে যাবে, এবং কিছুদিন কাজ করার পর সে যদি দেখে যে কম খেতে দিয়ে বেশী কাজ আদায় হচ্ছে তাহলে বছর কয়েকের জন্যে সে তাকে গ্রহণ করবে।

অলিভারকে যখন ঐ লোকটার সামনে এনে বলা হ'ল যে ওর সঙ্গে তাকে আজই কাজে যেতে হ'বে, এবং সে যদি যেতে রাজী না হয় কিংবা যদি গিয়ে কোনদিন সেখান থেকে পালিয়ে আসে তাহলে তাকে সমুদ্রের ধারে পাঠিয়ে ডুবিয়ে মারা হ'বে, তখন তার কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না। তাই দেখে সকলেই মতামত প্রকাশ করলে যে ও একেবারে গোল্লায় গেছে।

সেই রাত্রেই তাকে দিয়ে আসবার জন্যে বাম্বল্ রওনা হ'ল। খানিক দূর পর্য্যন্ত কেউ কোন কথা কইলে না। তারপর বাম্বল্ একবার পিছন ফিরে গম্ভীর ভাবে ডাকলে—অলিভার!

—বলুন সার্।

—তোমার চোখের ওপর থেকে টুপিটা সরাও।

অলিভার যদিও তাই করলে কিন্তু এবার তার চোখের জল বাধা মানলে না। বাম্বলের ঐ ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সামনে এক ফোঁটা জল ওর গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল। সে সেটাকে হাত দিয়ে মুছে নিতেই আবার এক ফোঁটা। আবার তারপর আরও এক ফোঁটা! সে এবার হু'হাতে চোখ ঢাকলে।

বাম্বল এবার কুপিত হয়ে কটমট করে চেয়ে বললে—ওঃ, যত

গুলো নীচ অকৃতজ্ঞ দেখেছি, তুই হচ্ছিস্ তাদের মধ্যে সবচেয়ে নীচ—সবচেয়ে—

অলিভার ফুঁপিয়ে উঠে বললে—না—না, আমি ভাল হ'ব। এবার থেকে আমি সত্যিই ভাল হ'ব। আমি ছোট বলে তাই—

—কি তাই ?

—তাই এরকম একলা একলা বোধ হয়। আমায় সবাই ঘৃণা করে। দোহাই আপনার, আমায় আর কিছু বলবেন না।

বাম্বল একবার তার দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে তাকে চোখ মুছতে বলে আবার চললো। যখন তারা সেই লোকটার দোকানে গিয়ে পৌছল তখন সে ছ' একটা ঝাঁপ বন্ধ করে সবেমাত্র হিসেব লিখতে বসেছে। তাদের দেখে হিসেব থেকে মুখ তুলে সে বলে উঠল—আস্থন, আস্থন বাম্বলমশাই।

—এই নিন্ আপনার ছোক্‌রা। বাম্বল্ উত্তর দিলে।

ওই নাকি ? বলে সে আলোটা অলিভারের মুখের কাছে এনে একবার ভাল করে ওকে দেখে নিলে। তারপর ভেতরে স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললে—ওগো শুনছ, একবার আসবে কি ?

ডাক শুনে মিস্ত্রী-গিন্নী ভেতর থেকে বিরক্ত মুখে বেরিয়ে এলেন। মিস্ত্রী জানালে—ওগো, এই ছেলেটার কথাই তোমায় সেদিন বলেছিলাম।

মিস্ত্রী-গিন্নী নাক সিঁটকে বললেন—ওযে বড্ড ছোট্ট।

বাম্বল্ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—তা বটে তা বটে। তা ভাবনা কি ? ও বাড়বে।

—যখন বাড়বে তখন বাড়বে। এখন ত বসিয়ে খাওয়াতে হ'বে। বলেই তিনি পাশের একটা দরজা খুলে অলিভারকে একটা ছোট অন্ধকার রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা মেয়ে বসেছিল, তাকে উদ্দেশ করে বললেন—সার্লোটি, এই ছেলেটিকে দু'এক টুকরো খাবার দেত মা। এর বেশী না খেলেও চলবে। তারপরে অলিভারের পানে তাকিয়ে শুধোলেন —কিগো, তোমার বেশী না হ'লেও ত চল্‌বে?

খাবারের নামে যদিও অলিভারের জিভে জল এসে পড়েছিল, তবুও অতিকষ্টে সে জানালে—হ্যাঁ।

যে দু টুকরো পেয়েছিল তা খাওয়া হবার পর মিস্ত্রী-গিন্নী জিগেস করলেন—তোমার হয়েছে তো?

হাতের কাছে আর কিছু খাবার না থাকায় অলিভার জানালে —হ্যাঁ।

—তাহ'লে আমার সঙ্গে এস। বলে তিনি তাকে উপরে নিয়ে এসে বললেন—এই পাটাতনের উপর তোমার শোবার জায়গা। ওখানে শুতে তোমার কষ্ট হবে না বোধ হয়, আর কষ্ট হ'লেই বা কি বল? তোমার ত আর কোন চুলোয় স্থান নেই। নাও দাঁড়িয়ে থেকো না, শুয়ে পড়।

অলিভার কোন কথা না বলে নব প্রভুপত্নীর আদেশ পালন করলে।

—পাঁচ—

এইবার ঘরের মধ্যে নিজেকে একলা পেয়ে অলিভার চারধারে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। তার আশে-পাশে পড়ে আছে খালি শবাধার, না হয় কাট্-কাটরা, নয় ত বা কালো কাপড়। সমস্ত মিলে যেন একটা বিকট বিভীষিকা। যেন তা' গোরস্থানের কথা আপনা থেকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে হয় যেন বা মৃত্যুর দূত চার পাশ থেকে তেড়ে আসছে। ঐ যেন সব ভূত-প্রেতের দল উঁকি মারছে।

তার ভয়ানক ভয় করতে লাগল। এই অনভ্যস্ত নতুন জায়গায় সে একেবারে একা। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, ভয়েতে চীৎকার করলেও বোধহয় তাকে কেউ সান্ত্বনা দিতে আসবে না। এই পৃথিবীতে আর তার আপন বলবার কেউ নেই। যখন সে নিজের বিছানায় শুল তখন তার মনে হ'ল যেন বা সে নিজের শবাধারের মধ্যে জ্যান্ত ঢুকে পড়ছে, তার চারপাশে যেন গোরস্থানের মাটি, গীর্জ্জার ঘণ্টা যেন অনবরত বেজে চলেছে।

পরের দিন সকালে দরজায় ধাক্কা শুনে অলিভারের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে দরজা খুলে দিতে-না-দিতে অন্ততঃ পঁচিশবার দরজায় লাথির শব্দ শুনতে পেলে, আর শুনতে পেলে একটা কণ্ঠস্বর তাকে উদ্দেশ করে বলছে—শীগ্গীর খোল্, তা না হলে তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলব!

সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে পথের এধার ওধার চেয়েও কারুকে দেখতে পেলে না। শুধু সামনে একটা পোষ্টের উপর একটা ভিখারী ছেলেকে বসে থাকতে দেখা গেল। অলিভার তাকেই গিয়ে শুধোলে—তুমিই দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলে?

—হ্যাঁ লাথাচ্ছিলুম।

—তোমার কি কোন শবাধার চাই?

এই প্রশ্নে ঐ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকটি ভয়ানক চটে গেল, ভাবলে অলিভার বুঝি তার সাথে ঠাট্টা করছে। তাই এবার গম্ভীর ভাবে বললে—আমি কে জানিস্?

—না।

—আমি হচ্ছি নোয়া ক্লেপোল্। তুই আমার তাঁবে কাজ করবি, শীগ্‌গীর ঝাঁপ তোল পাজী কোথাকার।

অলিভার অতি কষ্টে ভারী ভারী পাল্লাগুলো তুললে, ক্লেপোল্ও তাকে সাহায্য করলে। এমন সময় মিস্ত্রী-গিন্নী এসে হাজির হলেন, তারা তাঁর সঙ্গে প্রাতর্ভোজন সারতে গেল।

ভোজনের সময় অলিভারকে তারা ঘৃণায় একটু তফাতে রাখলে। ক্লেপোলও বেশ ঠাট্টা করতে লাগল, কেন না, এতদিন পরে সে একটা তবু ঠাট্টার জিনিস পেয়েছে। সে নিজে অপরের দয়ায় মানুষ হচ্ছে বটে, কিন্তু অলিভারের মত সে ত একেবারে অনাথ নয়।

অলিভার ওখানে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকবার পর একদিন মিস্ত্রী তার গিন্নীকে ডেকে বললে—ওগো শুনছ?—বলছিলুম কি—এই গিয়ে—এই অলিভারকে আর কি বেশ দেখতে।

—তা' গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছে, হ'বে না কেন ?

—না গো না, তার মুখের ওপর বেশ একটা বিষাদের ছায়া আছে। ওকে ভাড়াটে শবযাত্রী করব মনে করছি ! টাকা আসবে গো নিখরচায়।

গিন্নী কিছু না বলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

যাই হোক, মিস্ত্রীর কিন্তু সুযোগ জুট্‌তে দেরী হ'ল না। একদিন সকালে দোকান খুলতেই বাম্বল্ এসে হাজির। মিস্ত্রী তাকে অভ্যর্থনা করে বললে—আসুন, আসুন, কি খবর বাম্বল্-মশাই ? শবাধার চাই ?

—শুধু শবাধার নয়, ভাড়াটে শবযাত্রীও চাই। তার পরে কোথায়, কি বৃত্তান্ত সমস্ত বলে সে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

মিস্ত্রী জানালে—কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভাল। নোয়া, দোকানটা দেখিস, অলিভার, আয় আমরা ঘুরে আসি। অলিভার প্রভুকে অনুসরণ করলে।

সহরের একটা জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তারা একটা ভাঙা নোংরা বাড়ীর সামনে উপস্থিত হ'ল। তারা অন্ধকারে ভাঙা সীঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা দরজায় ধাক্কা মারতেই একটি চোদ্দ-পনের বছরের মেয়ে এসে দ্বার খুলে দিলে। তারা ভেতরে ঢুকল।

ঘরে বিশেষ জিনিষ-পত্তর নেই। একজন লোক একটা ষ্টোভ্ ধরাচ্ছিল, তার পাশে একজন বুড়ী বসে, ওধারে কতকগুলো

নোংরা, ছেঁড়া, জামা পরা শিশু রয়েছে। আর মাঝখানে কি একটা লম্বা করে কম্বল দিয়ে ঢাকা। মোড়া থাকলেও অলিভার বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ঐটাই হচ্ছে মৃতদেহ, তাই সে ভয়ে প্রভুর একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

মৃতদেহের মাপ নিতে যেতেই সেই লোকটা চীৎকার করে উঠল—ছুঁয়ো না, ওকে ছুঁয়ো না বলছি। ওকে কিছুতেই আমি মাটিতে নামাতে দেব না। মাটি চাপা অবস্থায় ও কিছুতেই থাকতে পারবে না, ওর কষ্ট হবে, ওকে পোকায় খাবে।

মিস্ত্রী কোন কথা না শুনে তার কাজ সারতে লাগল। ও তখনো চেঁচাচ্ছে—তোমরা সবাই ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসো। আহা! ও না খেতে পেয়ে মরেছে। মরবার সময় একটা বাতি পর্য্যন্ত জ্বলেনি, অন্ধকারে ছেলেদের নাম ধরে ডেকেছে, তবুও বাছাদের মুখ দেখতে পায় নি। ওকে বাঁচাবার জন্যে আমি রাস্তায় ভিক্ষে করতে গেছি, কিন্তু লোকে ভিক্ষে না দিয়ে আমায় পুলিসে দিয়েছে। ফিরে এসে দেখি ও আর নেই।

প্রয়োজনীয় কাজ সেরে মিস্ত্রী সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। পরের দিন মিস্ত্রী ও অলিভার শবাধার ও লোকজন নিয়ে গিয়ে দেখে যে বাম্বল্ আগে থেকেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। তাড়াতাড়ি মৃতদেহটাকে শবাধারে স্থাপন করে মিস্ত্রী বুড়ীকে বললে—এইবার একটু আমাদের সঙ্গে পা চালিয়ে আসুন, একেই ত আমাদের বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ওদিকে পাদ্রীসাহেব হয়ত অপেক্ষা করছেন।.

তাড়াতাড়ি যাবার কিন্তু কোন দরকার ছিল না, কেন না, যখন তারা গোরস্থানের এক নির্জ্জন কোণে এসে পৌঁছল, দেখা গেল যে পাদ্রীসাহেব অনুগ্রহ করে তখনো এসে উপস্থিত হন্ নি। যাই হোক্ প্রায় একঘণ্টা পরে তিনি এসে উপস্থিত হ'লেন এবং সাড়ম্বরে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল।

বাড়ী ফেরবার পথে মিস্ত্রী অলিভারকে শুধোলে—আচ্ছা অলিভার, তোর কেমন লাগল রে? অলিভার একটু ইতস্ততঃ করে বললে—সার্, ভাল লাগল না সার্।—

আচ্ছা-আচ্ছা, ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে যাবে। মিস্ত্রী জানালে।

অলিভার আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল যে মিস্ত্রীরও কি অনেক দিন লেগেছে এরকম অভ্যস্ত হ'তে? কিন্তু সে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

মত ক্লেপোলের ওপর লাফিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরলে, তারপর তাকে মাটিতে ফেলে প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

এক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে বালক শান্ত ছিল, মৃত মায়ের অপমানে সে যেন একেবারে ক্ষেপে উঠেছে, তার চোখের দৃষ্টি গেছে বদলে, বক্ষে হচ্ছে দ্রুততর স্পন্দন, এক অমিত শক্তি সে খুঁজে পেয়েছে।

—ওরে বাপ রে, গেলুম রে, আমায় খুন করলে রে। ক্লেপোল চীৎকার করে উঠল—ওরে সার্লোটি, আমায় একেবারে মেরে ফেললে রে।

চীৎকার শুনে সার্লোটি ও মিস্ত্রী-গিন্নী দুজনেই আরও জোরে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘটনাস্থলে দৌড়ে গেল। তারপর মিস্ত্রী-গিন্নী ও সার্লোটি দুজনে মিলে তাকে কষে চেপে ধরলে, ক্লেপোল উঠে পড়ে তাকে বেদম প্রহার দিলে। এই রকম অনেকক্ষণ চলবার পর যখন তারা হাঁপিয়ে পড়ল তখন অলিভারকে তারা কয়লাঘরে বন্ধ করে রাখলে।

এতক্ষণের প্রবল কসরতে ক্লান্ত হ'য়ে মিস্ত্রী-গিন্নী ধপ্ বসে পড়লেন। এদিকে অলিভার ত দরজা ভেঙ্গে ফেলবার উপক্রম করেছে।

মিস্ত্রী-গিন্নী চীৎকার করে উঠলেন—ওরে কি করব রে, কেউ যে বাড়ীতে নেই। ওটা যে একেবারে ক্ষেপে গেল!

সার্লোটি বললে—মা পুলিশ ডাকব?

মিস্ত্রী-গিন্নী খানিকক্ষণ কি ভেবে জানালেন—তার চেয়ে তুই

এক কাজ কর্ ক্লেপোল। দৌড়ে গিয়ে শীগ্‌গীর বাম্বল মশাইকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

বলবামাত্রই ক্লেপোল উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল। অনাথ আশ্রমের কাছে গিয়ে সে চোখ খামচিয়ে জল বার করে চেঁচাতে লাগল—বাম্বল্‌মশাই, বাম্বল্‌মশাই, শীগ্‌গির আসুন।

বাম্বল্ আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে—কেন রে?

—অলিভার—এঁ্যা এঁ্যা অলিভার—এঁ্যা এঁ্যা—

—আ-ম'লো, অলিভার কিরে? পালিয়েছে বুঝি বেটা বদ্‌মাইস?

—না বাম্বল্‌মশাই, সে আমাদের খুন করতে আসছে। বলে সে সমস্ত বৃত্তান্ত বেশ চটকদার করে রঙ্ চড়িয়ে বল্‌লে।

—আমি এখনি যাচ্ছি—বলে বাম্বল্ লাফিয়ে উঠল।

মিস্ত্রীদের বাড়ীতে তারা উপস্থিত হ'য়ে দেখলে যে মিস্ত্রী তখনো ফেরে নি, আর অলিভার সমান তালে দরজায় লাথি কষাচ্ছে। মিস্ত্রী-গিন্নী হাউ হাউ করে অলিভারের বিক্রম সম্বন্ধে যা বললে তা' শুনে বাম্বল্ একেবারে তার সম্মুখীন না হয়ে প্রথমে একটু ভূমিকা করাই সমীচীন মনে করলে। সেই উদ্দেশ্যে সে দরজার গর্ত্তের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হাঁকলে—অলিভার!

অলিভার ভেতর থেকে সাড়া দিলে—আমায় খুলে দাও বলছি শীগ্‌গীর।

বাম্বল্ আবার চেঁচিয়ে উঠল—তুই কি এ স্বর চিনতে পারছিস না অলিভার?

—হ্যাঁ চিনেছি—জবাব এল।

—তোর ভয় করছে না তবুও ?

—না—অলিভার সাহস ভরে জবাব দিলে।

এরকম অপ্রত্যাশিত জবাব শুনে বাম্বল্ কেমন যেন একটু ভড়কে গিয়ে আব সকলের দিকে তাকালে। মিস্ত্রী-গিন্নী তাড়াতাড়ি বলে উঠল—ও একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে বাম্বলমশাই, নইলে আপনার মুখের ওপর এরকম বলতে সাহস করে !

বাম্বল্ একটু বিজ্ঞের মত খানিকটা কি ভেবে জানালে—পাগল নয়, পাগল নয়—ও হচ্ছে মাংসের ঝাঁঝ।

—কি-কি—বাম্বল মশাই ?

—মাংসের ঝাঁঝ। তোমরা ওকে বেশী খাইয়ে দাইয়ে ওর মধ্যে আর একটা ভূতকে ডেকে এনেছ। সেই জন্মেই ত আমাদের আশ্রমে শুকিয়ে রাখবার নিয়ম আছে ! তোমরা ওকে না খেতে দিয়ে শুকিয়ে রাখ দেখি, দেখবে কি হয়।

সকলেই তার প্রস্তাব অনুমোদন করলে পর সে আবার বলে চলল—এখন দরকার হয়েছে খালি ওকে খেতে না দিয়ে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা। বেটার মা-টা ছিল যেমন তেমনি ত হ'বে।

মার প্রসঙ্গ নিয়ে আবার আলোচনা হচ্ছে শুনতে পেয়ে অলিভার পুনরায় দরজায় লাথাতে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই সময় মিস্ত্রী এসে উপস্থিত হ'ল। তাকে সকলে মিলে সমস্ত ব্যাগারটা শাখা-পল্লবে পুষ্পিত করে বলায় সে ভেতরে ঢুকে গিয়ে অলিভারকে

বেদম প্রহার দিলে। এমন মার মারলে যে বাম্বলের আর বেত লাগাবার প্রয়োজন হ'ল না।

সারা সময়টা অলিভার নির্জ্জন ঘরে পড়ে রইল। এবার রাত্রির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবতে সুরু করলে তার অদৃষ্টটা। সে নীরবে ওদের সমস্ত অপমান সহ্য করেছে, কিছুই ত বলেনি, কিন্তু তবু কেন ওরা তার মার নাম ধরে অমন বিশ্রী সব কথা বল্‌লে। তাতে কি তার কষ্ট হয় না? সে কী এমন অন্যায় করেছে যে তার এই ভয়ঙ্কর শাস্তি!

সে একবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে। শীতাচ্ছন্ন তারা-ভরা রাত্রি, সারা দিঙ্‌মণ্ডল ব্যেপে থম্‌থমে অন্ধকার যেন সমস্ত জায়গাটাকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে, ভয় পেয়ে সে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিয়ে প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পূব্‌ গগনে ভোরের আলো উঁকি দেওয়ার সাথে সাথেই সে দরজা খুললে। একবার যেন ইতস্ততঃ করলে, যেন ভয় পেয়ে পেছন ফিরে চাইলে। তারপর সোজা সে রাস্তায় নেমে পড়ে গাড়ীগুলো যে পাহাড়ে রাস্তার উদ্দেশে ছুটেছে, সেই ধারেই পা চালিয়ে দিলে।

যে রাস্তা দিয়ে সে হাঁটছিল সেটা অনাথ আশ্রমের সামনে দিয়েই গেছে। অলিভারের মনে পড়ল যে এই রাস্তা ধরেই সে একদিন বাম্বলের সঙ্গে ঐ আশ্রমে ঢুকেছিল। আশ্রমের কথা মনে পড়তেই তার বুক একবার ঢুর্ ঢুর্ করে উঠল, একবার ভাবলে ফিরে যায় অন্য রাস্তায়, কিন্তু সে অনেকখানি পথ এসে পড়েছে। া' ছাড়া এখনো হয় ত কেউ জেগে ওঠেনি।

—সাত—

খানিকটা হেঁটেই সে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। তখন আটটা বেজেছে। তার সর্ব্বদাই ভয় হচ্ছে হয় ত' কেউ দেখে ফেলবে, তাই সাধ্যমত সন্তর্পণে সে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে চলেছে। পাঁচ মাইল সে এরকম করে এক দমে চল্‌ল, তার পরে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের পাশে বসে পড়ল।

যে পাথরটার পাশে সে বসেছিল, সেটা হচ্ছে একটা মাইল্‌-ষ্টোন্। তাতে লেখা আছে যে লণ্ডন সেখান থেকে ৭০ মাইল। লণ্ডনের নাম দেখেই তার মনের মধ্যে অনেক রকম চিন্তা খেলে গেল। আহা লণ্ডন! সেই জনাকীর্ণ সহর। সেখানে গেলে কেউই আর তাকে খুঁজে পাবে না, বাম্বল্‌ও নয়। লণ্ডনের নাম সে ইতিপূর্ব্বে অনাথ আশ্রমে অনেকবার শুনেছে, শুনেছে যে সেখানে গেলে কারও আর কোন ভাবনা থাকে না, তাই ভাবলে যে পালিয়ে গিয়ে সে নিশ্চয়ই সেখানে একটা আশ্রয় পাবে চিন্তামাত্রই সে লাফিয়ে উঠে লণ্ডনের উদ্দেশে হাঁটতে আরম্ভ করলে।

আরও চার মাইল হেঁটে সে হিসেব করে দেখলে যে এখনো অনেক পথ। তার সম্বলের মধ্যে আছে ত একটা ময়লা সার্ট দুটো মোজা ও একটা বাণ্ডিল। একটা পয়সাও আছে বটে। ঐ

দিয়ে ত আর ৬৬ মাইল হাঁটা যাবে না! ভেবে-চিন্তে কোন কূল কিনারা না পেয়ে সে বাণ্ডিলটা এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে চলতে লাগল।

সেদিন সে কুড়ি মাইল হাঁটলে। এতক্ষণ তার পেটে কিছুই পড়েনি শুধু সে খেয়েছে ধূলো, হাওয়া আর পেট ভরে জল। অন্ধকার হয়ে আসতেই সে মাঠের ধারে একটা গাছতলায় শুয়ে পড়ল। প্রথমটা তার ভয়ানক ভয় করছিল, কেন না, ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে বাতাসের একটা হূ-হূ শব্দ ভেসে আসছিল। তা' ছাড়া একলা সে কখনো এ রকম অবস্থায় পড়েনি। যাই হোক্ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে উঠে সে দেখলে যে গা হাত পা তার ব্যথায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। খিদের জ্বালায় একটা পয়সা যা ছিল সেটাও খরচ হয়ে গেল। রাত্রি আসবার আগে সেদিন সে বারো মাইল হাঁটলে।

এই রকম করে আরো একটা রাত্রি, আরও একটা! এবার তার পায়ের এমন অবস্থা হ'ল যে পাদুটো যেন কাঁপতে আরম্ভ করেছে, সে আর চলতে পারছে না। নিরুপায় হয়ে সে পথের ধারে অপেক্ষা করতে লাগল এই ভেবে যে, কোন গাড়ী গেলে সে যাত্রীদের অনুনয় বিনয় করে তাতেই একটু জায়গা করে নেবে। গাড়ী গেল বটে, কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করলে না।

কোন কোন গ্রামে বোর্ড লট্‌কানো আছে যে, যে কেউ ভিক্ষে

করবে তাকেই জেলে দেওয়া হ'বে। অলিভারের তা দেখেই ত একেবারে চক্ষু স্থির। সে তাড়াতাড়ি সে-স্থান ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সে কোথায় যাবে? লোকের বাড়ীতে আশ্রয় চাইলে তারা তাকে চোর ভাবে। দোকানে উঁকি মারলে তারা কুকুর লেলিয়ে দেয়। সে এখন করে কি? যদি একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দয়াপরবশ হ'য়ে তাকে খাবার না দিতেন, তাহলে হয়ত সে রাস্তায়ই মরে পড়ে থাকত। ঐ নারীটি তাকে তাঁর সাধ্যমত কিছু প্রদান করলেন, আরও দিলেন মায়া, মমতা সহানুভূতি ও অজস্র আশীর্ব্বাদ। অলিভারের সমস্ত কষ্ট মুহূর্ত্তের জন্য যেন দূরীভূত হ'য়ে গেল।

সপ্তম দিবসের সকালবেলা অলিভার বার্ণেট্ নামক এক সহরে প্রবেশ করলে। তখনো সারা রাস্তার ওপর যেন সুপ্তির মায়া, দোকান-পাট তখনো খোলেনি শীঘ্রই সব খুলতে আরম্ভ হ'ল। পথচারীদের মধ্যে অনেকেই অলিভারের পানে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু কেউ-ই কোন সাহায্য করলে না। সে রাস্তার ধারে চুপ করে বসে রইল।

এ রকম খানিকক্ষণ থাকবার পর তার সমবয়সী একটা ছেলে অনেক বার ধরে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—তুমি এখানে এ রকম করে বসে আছ কেন? এ কথায় সে তার দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে যে ছেলেটার চোখে কেমন যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টি, পোষাক-পরিচ্ছদ তার ঠিক আলখাল্লার মত, সে যেন নোংরামির চূড়ান্ত।

প্রশ্নের উত্তরে অলিভার জানালে যে তার বড্ড পেয়েছে। সাত দিন ধরে সে বিশেষ কিছুই খায় নি, শুধুই হেঁটেছে।

তার কথা শুনে ছোকরা তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর সামনের একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে বেশ করে খাওয়ালে। তারপর শুধোলে—তুমি লণ্ডন যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

—সঙ্গে বিছানা-পত্তর, টাকাকড়ি আছে ?

—না।

ঐ ছোকরা তখন তার জামার পকেটে যতখানি হাত যায় পুরে দিয়ে বিস্ময়সূচক শব্দ করে উঠল। অলিভার জিগেস করলে --তুমি কি লণ্ডনেই থাক ?

—হ্যাঁ, আমি মাঝে মাঝে থাকি। তোমার নিশ্চয়ই আজ রাত্রে ঘুমোবার আশ্রয় দরকার।

অলিভার জানালে, হ্যাঁ।

সে বল্‌লে যে আজ রাত্রেই সে লণ্ডন যাবে। সেখানে একজন অমায়িক ভদ্রলোক আছেন, কেউ যদি অলিভারকে তাঁর কাছে পরিচয় করিয়ে দেয় ত তিনি তাকে আশ্রয় দিতে পারেন। এ সংবাদে অলিভার লোভাতুর হয়ে ঐ ছোকরার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে জেনে নিলে যে তার নাম হচ্ছে জ্যাক্ ডকিন্স্, এবং তার সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের আলাপ আছে। অনেক কথা-বার্ত্তার পর সে তাকে সেখানে নিয়ে যেতে রাজী হ'ল, কিন্তু কি জানি কেন [illegible]

ট্রেনে যেতে সে আপত্তি করলে। তাই তাদের লণ্ডন পৌঁছতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল।

তারা নানান্ রাস্তা দিয়ে চলেছিল। অলিভারের চোখ ছিল যদিও তার সঙ্গীর ওপর, তবুও মাঝে মাঝে সে বড় বড় অট্টালিকা ও দোকান-পাটের দিকে না তাকিয়ে পারে নি! কী সুন্দর সে দৃশ্য! অলিভার যেন একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। ক্রমশঃ তারা একটা নোংরা পাড়ায় এসে ঢুকল। এখানে ওখানে কাদা জমে রয়েছে, রাস্তা অপরিষ্কার, লোকগুলো সব মদ খেয়ে হল্লা করছে। তার একবার মনে হ'ল যে সে এখান থেকে ছুটে পালায়। কিন্তু সে কিছু ভেবে ঠিক করবার আগেই তারা একটা নোংরা বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হ'ল।

তার সঙ্গী তার হাত ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা শব্দ করতেই একজন লোক আলো নিয়ে বেরিয়ে এসে জিগেস করলে—ওহো, দু'জন দেখছি যে! ওটা আবার কে?

জ্যাক্ ডকিন্স্ অলিভারকে টানতে টানতে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বল্‌লে—ও নতুন এসেছে। ফ্যাগিন্ কোথায়?

—ফ্যাগিন্ ওপরে আছে, তোমরা এসো। বলেই সে-লোকটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অতি কষ্টে সঙ্গীর হাত ধরে অলিভার ওপরে উঠে একটা ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরের চেহারা জরাজীর্ণ,এধারে ওধারে ঝুল ও কালী জমে আছে। একপাশে একটি উনুন জ্বলছে, তাতে কড়ায় করে কি রান্না হ'চ্ছে। তারই সামনে একটা বাটি হাতে করে এক

বুড়ো ইহুদি দাঁড়িয়ে, তার চোখের দৃষ্টি যেন হিংস্র, কপালের ওপর দীর্ঘ চুলের গোছা এসে মুখখানাকে যেন ঢেকে ফেলেছে। ওপাশে একটা টেবিলের ধারে তার সঙ্গীর বয়সী কতকগুলো ছেলে বসে, সামনে তাদের খানকয়েক সিল্কের রুমাল ঝুলছে। ডকিন্স্ গিয়ে বুড়ো ইহুদিটাকে কি বলতেই সে অলিভারকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললে—তোমায় পেয়ে বাবা আমরা কত খুসী হলুম। ওহো, তুমি ওই রুমালগুলো দেখছ? হা-হা-হা ও রকম কত আছে দেখবে'খন। তার পরে সে তাকে একটা গ্লাসে করে একটু পানীয় দিয়ে সেটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বললে। খাওয়ার পরই অলিভার কাছের একটা ছেঁড়া বিছানার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে অলিভারের ঘুম ভাঙতে সে চোখ চেয়ে দেখলে যে ঘরে কেউ নেই, শুধু ফ্যাগিন্ এক কোণে দাঁড়িয়ে কফি তৈরী করছে, আর নিজের মনে শিস্ দিচ্ছে। অলিভারের যদিও ঘুম ভেঙ্গে গেছল, তবুও তার ঝিমুনি কাটে নি, তাই সে আবার চোখ বুজ্‌ল। চোখ বুজলেও সে এক একবার চেয়ে চেয়ে দেখ-ছিল, শুনলে বুড়ো ইহুদি তার নাম ধরে একবার ডেকে উঠল। সে কোন সাড়া দিলে না। তার সাড়া না পেয়ে ফ্যাগিন্ কোথা থেকে একটা বাক্স টেনে বার করলে, বার করেই সে সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাতে লাগল। তারপর সে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সেই বাক্স থেকে একটা বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত সোনার ঘড়ি বার

বুড়ো আপন মনে বলে উঠল—আঃ ! কী চমৎকার। তার পরে আরও নানান্ রকম অলঙ্কার বার করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে বললে—কেউ টের পায় না, কী ব্যবসাই চালিয়েছি ! বলে নিজে নিজেই সে হেসে উঠল। পরক্ষণে সে সমস্তগুলো আবার বাক্সয় ভরে রেখে দিলে।'

ইতিমধ্যে হঠাৎ তার দৃষ্টি অলিভারের ওপর পড়াতে সে দেখলে যে অলিভার তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। বুড়ো উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠল—তুই যে বড় জেগে আছিস্, কি দেখেছিস, বল্ কি দেখেছিস্, শীগ্‌গীর বল্ ?

—আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল যে। ভয়ে ভেয়ে অলিভার জবাব করলে।

—একটু আগে তুই জেগে ছিলিস্ না ?

—না সার্।

এতে ইহুদি বুড়ো আশ্বস্ত হয়ে তার সেই আগেকার আদরের সুরে বললে—হা-হা-হা, আমি তা জানতাম। আমি শুধু তোমায় ভয় দেখাচ্ছিলাম, না তুমি খুব সাহসী ছেলে। তারপরে বাক্সটা দেখিয়ে অলিভারকে শুধোলে—তুমি এই বাক্সর জিনিষ কিছু দেখনি, নয় ?

—হ্যাঁ সার্, দেখেছি।

জবাব শুনে প্রথমটা বুড়ো যেন কেমন বিবর্ণ হ'য়ে গেল। তারপর বললে—হা-হা অলিভার, ও-সব আমার বুড়ো বয়সে বাঁচবার সম্পত্তি। আমি অনেক কষ্টে ওগুলো জমিয়েছি, তাই লোকে আমায় কৃপণ বলে।

ক

অলিভার ভাবলে সত্যিই হয় ত বুড়ো ভয়ানক কৃপণ। ইতি-মধ্যে সে কিন্তু বাক্সটা লুকিয়ে রেখেছে। ক্রমে ক্রমে ছেলের দল আসতে লাগল। বুড়ো একে একে তাদের জিগেস করলে—তুমি কি পেয়েছ?

—পকেট বুক।

—তুমি?

—ব্যাগ।

—আচ্ছা, তুমি?

—রুমাল।

জবাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা সব জিনিসপত্তর টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে লাগল। অলিভার রুমালের দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বুড়ো বললে—তোমার চাই একখানা, অলিভার? তুমিও ওদের মত চেষ্টা করলে এ-সমস্ত আনতে পার। তুমি শিখবে এ সব কি করে আনতে হয়?

—হ্যাঁ সার্, আপনি যদি অনুগ্রহ করে শিখিয়ে দেন।

তার এই সরলতাপূর্ণ জবাব শুনে আর সব ছেলের দল হো হো করে হেসে উঠল।

এই হাসির কারণ কি ভেবে না পেয়ে অলিভার আশ্চর্য্য হয়ে তাকাতে, বুড়ো বললে—তুমি কিছু ভেবো না অলিভার। ক্রমশঃই সব জানতে পারবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা বুড়োর সঙ্গে দুটো ছেলের এমন

এক অদ্ভুত খেলা চলল যা দেখে অলিভার ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল বুড়ো তার পায়জামার পকেটে একটা নস্যির কৌটো ও ওয়েষ্টকোটের পকেটে একটা ঘড়ি রেখে তার ওপর-কোটের বোতাম এঁটে ঠিক যেন রাস্তার ভদ্রলোকের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। সময়ে সময়ে সে জানলার কাছে বা টেবিলের ধারে দাঁড়াচ্ছে এবং এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে যে, সে দোকানের জিনিস-পত্তর নিরীক্ষণ করছে। মাঝে মাঝে চোরের ভয়ে পকেটে জিনিষগুলো আছে কিনা দেখে নিয়ে সে সতর্ক হচ্ছে। ইত্যবসরে ছেলে ছুটো তার দৃষ্টির আড়ালে থেকে যেন তাকে অনুসরণ্ করছে। হঠাৎ একজন পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার পা মাড়িয়ে দিলে, আর একজন অমনি তার ঘাড়ের ওপর হুম্ড়ি খেয়ে পড়ল। আর সেইটুকুর মধ্যেই তারা তার পকেট থেকে অদ্ভুত কৌশলে জিনিসগুলো বেমালুম সরিয়ে নিলে। সময়ে সময়ে বুড়ো পকেটে তাদের হাত ধরেও ফেলছিল। এই রকম কিছুক্ষণ চলবার পর তাদের খেলা সাঙ্গ হ'ল।

ইতিমধ্যে ছু'জন মেয়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাদের এক জনের নাম বেট্, আরেকজনের নাম নান্সি। তারা নোংরা হ'লেও, দেখতে কিন্তু তাদের বেশ ভালই। বুড়ো ইহুদির সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বলে তারা টাকা নিয়ে আর ছেলে ছুটোকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল। ফ্যাগিন্ তখন অলিভারকে বললে—দেখ বাবা, দেখ, ওরা কেমন আনন্দে আছে।

—ওদের কি কাজ হ'য়ে গেল?

হ্যাঁ হয়ে গেল বৈকি। তবে ওরা বাইরে বেড়াতে বেড়াতে যদি কোন কাজের সুযোগ পায় ত ছাড়বে না। তুমি ওদের মত হও বাবা, ওরা যা বলবে তাই শুনো ধন। তা হলেই তুমি মস্ত লোক হবে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—আমার পকেটের ওপর রুমালটা একটু-খানি বেরিয়ে আছে, নয়?

অলিভার জানালে—হ্যাঁ।

—দেখ দিখিনি তুমি ওদের মত আমায় না জানিয়ে এটা তুলে নিতে পার কিনা!

অলিভার ওদের যেমনটি দেখেছিল ঠিক তেমনি ভাবে এক হাতে পকেটের তলা ধরে আরেক হাতে রুমালটাকে আস্তে আস্তে টেনে নিলে!

বুড়ো হাঁকল—নিয়েছ কি।

অলিভার রুমালটা হাতে তুলে নিয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বুড়ো তখন তার পিঠ চাপড়ে জানালে—তুমি বাবা বেশ চালাক ছেলে, আমি তোমার মত আর কারুকে দেখিনি। তুমি নিশ্চয়ই মস্ত লোক হ'বে।

অলিভার কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেলে না যে পকেট থেকে রুমাল তুলে নেওয়ার সঙ্গে মস্ত লোক হওয়ার কী সম্পর্ক আছে।

—আট—

কিছুদিন এখানে থাকবার পর অলিভার বুড়োকে জানালে যে সেও ওদের সঙ্গে কাজে যাবে, কেন না, তার ভয় হয়েছিল যে কাজে না গেলে হয়ত বুড়ো তার ওপর বিরূপ হ'বে, যদিও ওরা কি কাজে বেরোয় তার কোন স্পষ্ট ধারণা অলিভারের ছিল না। তার এই ভয়ের কারণও ছিল! ছেলেগুলো যেদিন সন্ধ্যায় শুধু হাতে ফেরে সেদিন বুড়ো তাদের খেতে দেয় না, এমন কি মার-ধোরও করে। তাই কাজে বেরোবার জন্যে অলিভারের এত জিদ চেপেছিল।

অবশেষে একদিন সে অনুমতি পেলে। দু' দিন ধরে ঘরে কোন জিনিসপত্তর আসে নি, তাইতেই বাধ্য হয়ে হয়ত বুড়ো তাকে অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু তবুও তাকে সে আর দুটো ছেলের অভিভাবকত্বে ছেড়ে দিলে।

তিনজনে এক সঙ্গে বেরোল। প্রথমে তারা এত আস্তে আস্তে, থামতে থামতে এধার-ওধার চেয়ে চল্‌তে লাগল যে অলিভারের সন্দেহ হ'ল হয়ত' তারা কোন কাজই করবে না, শুধু মিথ্যে বুড়োকে ভোলাবার জন্যে বেরিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ সঙ্গীদের চালচলনের পরিবর্ত্তনে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।—দেখ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—ওই ব'য়ের দোকানে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে না ?

াকের পকেটে হাত চালিয়ে দিয়েছে।

—পৃঃ ৪৯

হ্যাঁ ভাই।

—চল্, ও হলেই চলবে।

অলিভার আশ্চর্য্য হ'য়ে তাদের পানে তাকালে। তারা কিন্তু তাকে কোন কথা জিগেস করতে দিলে না, তাই সে তাদের পাছু-পাছু গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে তাদের সমস্ত হালচাল দেখতে লাগল।

ভদ্রলোকটিকে দেখতে বেশ সম্ভ্রান্ত, গায়ে তাঁর দামী পোষাক, চোখে সোনার চশমা, হাতে একটা বেতের মোটা ছড়ি। তিনি বইয়ের দোকান থেকে একখানা বই নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন। তাঁর চোখের সামনে থেকে রাস্তা, লোকজন, দোকান-পত্তর সমস্ত যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে, শুধু রয়েছে পাতার পর পাতা। অলিভার খানিক দূরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল, কেন না, সে দেখতে পেলে যে তার সঙ্গীদের মধ্যে একজন বেমালুম ঐ ভদ্রলোকের পকেটে হাত চালিয়ে দিয়েছে। তারপর একখানা রুমাল তুলে নিয়ে সে অপর সঙ্গীর কাছে চালান করে দিয়ে দুজনে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে অলিভারের কাছে এতদিনকার সেই সব খেলা, আর ঘড়ি, রুমাল ও অলঙ্কার-রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ কী করবে যেন সে ঠিক করতে পারলে না, তার রক্ত যেন সব বরফ গেছে। ভয়ে সেও ছুটতে আরম্ভ করলে।

অলিভার যখনই ছুটতে আরম্ভ করেছে তখনি ভদ্রলোক তার টে হাত দিয়ে রুমাল না পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন যে া ছেলে দৌড়চ্ছে। অমনি তিনি 'চোর-চোর, পাকড়াও-

পাকড়াও' শব্দ করতে করতে তার পেছনে ধাওয়া করলেন। শুধু যে তিনি একলা দৌড়লেন তা নয়, অলিভারের সঙ্গী দুটিও ধরা পড়বার ভয়ে এতক্ষণ নিকটস্থ একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারাও 'চোর-চোর' বলে ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

অলিভার ভয় পেয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগল, আর তার পেছনে সেই শব্দ—চোর-চোর পাকড়াও-পাকড়াও। ক্রমশঃ তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলে। রাস্তার ছেলে-বুড়ো সবাই চেঁচাতে লাগল —চোর-চোর, পাক্ড়াও-পাক্ড়াও। সারা আকাশে বাতাসে যেন ঐ কথাগুল্যোই গম্ভীরভাবে ধ্বনিত হ'চ্ছে। দোকানদার, মাছওয়ালা, ঝাঁকামুটে যে যার কাজ ফেলে ছুটেছে 'চোর-চোর, পাকড়াও-পাকড়াও' শব্দ করতে করতে।

অবশেষে সে ধরা পড়ল। ধরা পড়বামাত্রই সে কী চাঁদা করে প্রহার! প্রথম ঘুসীতেই সে মাটিতে শুয়ে পড়ল, তার ওপর কিল-চড়-লাথি। ভদ্রলোক উপস্থিত হতেই সবাই সমস্বরে শুধোলে—এ-ই মশায়, এ-ই আপনার পকেট মেরেছিল ?

ভদ্রলোক উত্তর করলেন—হ্যাঁ। কিন্তু আমি ছেলেটির অবস্থা ভেবে ভয়ানক উৎকণ্ঠিত হচ্ছি, ওর বড্ড লেগেছে !

—লাগবে না মশাই ? বেশ হয়েছে, যেমন কাজ !

শীঘ্রই পুলিশ এল। সে তাকে ঘাড় ধরে তুলে একটা গুঁতো মেরে বললে—এই চল্।

অলিভার চেঁচিয়ে উঠল—আমি না মশাই, আমি নয়। দোহাই

আপনার, আমায় ছেড়ে দিন। আর দুটো ছেলে নিয়েছে, তারা এখানেই কোথায় আছে।

পাহারওয়ালা কোন কথা না শুনে তাকে আর একটা ধাক্কা দিয়ে বললে—চল্ চল্, ওরকম কাঁদুনী ঢের শুনেছি!

ভদ্রলোক বলে উঠলেন—আহা, মেরো না ওকে।

—না না, মারিনি। বলে' পাহারওয়ালা তার জামার কলারটা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে তাকে থানায় নিয়ে চলল। ভদ্রলোকও চললেন তার পাশে পাশে, আর পেছনে চলল অগণিত ভীড় মজা দেখবার আশায়।

নিকটস্থ থানায় যেতেই একজন মোটা-সোটা কর্ম্মচারী বলে উঠ্‌লেন—কী ব্যাপার? এত ভীড় কিসের?

পাহারওয়ালা অলিভারকে দেখিয়ে জানালে যে এই একজন পকেটমার। কর্ম্মচারীটি ভদ্রলোকের পানে চেয়ে বললেন—আপনারই পকেট মেরেছে মশাই?

ভদ্রলোক উত্তর করলেন—হ্যাঁ। তা আমি ঠিক ওকে নিতে দেখিনি, আমি এই 'কেস্' চালানোর জন্যে জেদ করব না।

—যাই হোক্, আপনাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হতে হবে। বলেই কর্ম্মচারিটি অলিভারকে হাজতে পুরলেন।

ভদ্রলোকটি আপন মনে ভাবতে লাগলেন—ছেলেটি নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ। ওর মুখের ওপর এমন একটা ভাব আছে যা মন কেড়ে নেয়। ওর মত মুখ যেন আমি কোথায় দেখেছি। কিন্তু তিনি কিছুতেই এর অধিক কিছু ধারণা করতে সক্ষম হলেন না।

অবশেষে তাঁদের মিষ্টার ফ্যাংএর এজ্‌লাসে ডাক পড়ল। মিষ্টার ফ্যাং হচ্ছেন একজন বিখ্যাত বিচারক, মাথায় টাক, মুখের ভাব দেখলেই ভয় হয়। ভদ্রলোক তাঁর কাছে গিয়ে নিজের সমস্ত নাম-ধাম বলে প্রশ্নের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিষ্টার ফ্যাং তখন খবরের কাগজে তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ মন্তব্য হয়েছে তাই পড়ছিলেন। পড়ে তিনি চটেই ছিলেন, তাই ভদ্রলোককে সামনে দেখে ধমকে উঠলেন—তুমি কে?

ভদ্রলোক বেশ আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর নামাঙ্কিত কার্ডের প্রতি ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

মিষ্টার ফ্যাং তখন কার্ডখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পেশকারকে শুধোলেন—এ লোকটা কে হে?

ভদ্রলোক তখনো ভদ্রভাবেই বল্‌লেন—মশাই, আমার নাম হচ্ছে ব্রাউন্‌লো। আমি কি জানতে পারি আদালতের আশ্রয়ে যে ম্যাজিষ্ট্রেট আমায় অন্যায় ভাবে অপমান করলেন তাঁর নামটি কি?

মিষ্টার ফ্যাং তখন রেগে বললেন—পেশকার, একে কি জন্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে?

পেশকার ভয়ে ভয়ে জানালে—হুজুর, ওঁকে অভিযুক্ত করা হয়নি, একটি ছেলের বিরুদ্ধে মামলা চালাবার জন্যে উনি হাজির হয়েছেন।

মিষ্টার ফ্যাং ঘৃণার দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন—মামলা চালাবার জন্যে এসেছে নয়? ওকে শপথ করাও।

—শপথ করবার পূর্ব্বে আমি একটা কথা বলতে চাই যে—

—চুপ করো। ম্যাজিষ্ট্রেট ধমকে উঠলেন।

—আমি চুপ করব না।

—শীগ্‌গীর চুপ কর, তা না হ'লে আমি তোমায় বার করে দেব। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের ওপর কথা!

এরকম বহু বাদানুবাদের পর শপথ গ্রহণ করা হল। তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট জিগেস করলেন—বালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? আপনার কি বলবার আছে মশাই?

ব্রাউনলো বলছিলেন—আমি একটা ব'য়ের দোকানে দাঁড়িয়ে-ছিলাম,—বলতেই মিষ্টার ফ্যাং বলে উঠলেন—চুপ করো, চুপ করো। পাহারওয়ালা—পাহারওয়ালা, পাহারওয়ালা কোথায়? ওই বুঝি। আচ্ছা ওকে শপথ করাও। তোর কি বলবার আছে রে পাহারওয়ালা?

পাহারওয়ালা অতি বিনয় সহকারে যা জানত তাই বিবৃত করলে।

মিষ্টার ফ্যাং শুধোলেন—কোন সাক্ষী আছে?

—না হুজুর।

তখন মিষ্টার ফ্যাং খানিকক্ষণ কী ভেবে ব্রাউনলোকে বললেন—তোমার কি বলবার আছে বলো? আদালতে দাঁড়িয়ে তুমি যদি সাক্ষ্য না দাও তবে তোমায় আমি শাস্তি দেব।

ব্রাউনলো মশাই অনেক অপমান সহ্য করে যা জানতেন তাই বললেন। পরিশেষে জানালেন যে ছেলেটিকে অতিরিক্ত প্রহার করাব দরুণ বোধহয় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট তখন একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অলিভারকে বললেন—এই ছোঁড়া পকেটমার, তোর নাম কিরে ?

অলিভার কি বলতে গেল কিন্তু জিভ তার নড়ল না। সে ভয়ে শাদা হয়ে গেছে—তার চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। মিষ্টার ফ্যাং তেড়ে উঠলেন—আম'লো, তোর নাম বল্ না ? পেশকার ওর নাম কি হে ?

পেশকার অলিভারকে নাম জিগেস করলে, কিন্তু তার বলবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে। মিষ্টার ফ্যাং চটে গিয়ে এখুনি তার কারাবাসের মেয়াদ বাড়িয়ে দেবে ভেবে পেশকার দয়া-পরবশ হয়ে বানিয়ে বললে—হুজুর, ও বলছে যে ওর নাম টম্ হোয়াইট্।

—আচ্ছা আচ্ছা, কোথায় থাকে ও ?

পেশকার আবার বানিয়ে বললে—যেখানে আশ্রয় পায় হুজুর।

এই সময় অলিভার কাতর ভাবে একটু জল চাইলে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলে উঠলেন—চুপ কর্ হতভাগা, আমায় বোকা বানাবি ?

ব্রাউনলো বললেন—ওর বোধহয় সত্যিই অসুখ করেছে।

—থামো থামো, আমি তোমার চেয়ে ভাল বুঝি।

ব্রাউনলো তবু জানালেন—পেশকার মশাই ওকে ধরুন, নয় ত ও এখনি পড়ে যাবে। মিষ্টার ফ্যাং ধমকে উঠলেন—খবরদার কেউ ধরবে না।

অলিভার কিন্তু সত্যিই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। কর্ম্মচারীরা সব মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল, তবুও কেউ ধরতে সাহস পেলে না।

মিষ্টার ফ্যাং বলে উঠলেন—আমি জানি ও ভাণ করছে, ওকে ঐ রকম থাকতে দাও, দেখি কতক্ষণ থাকে ও।

পেশকার ভয়ে ভয়ে শুধোলে—হুজুর, ওর বিচারের কি হ'ল?

—হ্যাঁ, তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড। আদালত বন্ধ করো।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করবার জন্যে কর্ম্মচারীরা সব ব্যস্ত হয়ে উঠল। এমন সময় একজন লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—থামো থামো, একটু অপেক্ষা কর, ভগবানের দোহাই।

মিষ্টার ফ্যাং ত একেবারে চটে খুন। তাই হেঁকে ধমকে উঠলেন—বার করে দাও, ও-লোকটাকে বার করে দাও। শীগ্গীর আদালত বন্ধ কর।

লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—আমি যাব না, আমি সাক্ষ্য দেব। আমি হচ্ছি সেই বইয়ের দোকানের কর্ম্মচারী, আমি সমস্ত দেখেছি। আমায় শপথ করানো হোক্, আপনি শুনুন আমার জবানবন্দী।

লোকটার দৃঢ়তা দেখে ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন—আচ্ছা, লোকটাকে শপথ করাও। তোমার কি বলবার আছে?

লোকটা তখন তিনটে ছেলের বিষয় যা জানত এবং যা দেখেছিল তাই বিবৃত করলে, সেই আর দুটো ছেলেই পকেট মেরেছে, এ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

—তুমি আগে আস নি কেন?

—কি করে আসব বলুন, দোকান ফেলে ত আর আসতে পারি না।

ম্যাজিষ্ট্রেট তখন আরও দু' চারটে প্রশ্ন জিগেস করার পর আদেশ দিলেন—আচ্ছা, ছোঁড়াটাকে ছেড়ে দাও, আদালত বন্ধ করো।

কর্ম্মচারীরা আবার তাঁর আদেশ পালন করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। ব্রাউনলো মশাইকে জোর করে বার করে দিতেই তিনি বাইরে এসে দেখলেন যে অলিভার ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে দেখেই তাঁর মনটা যেন কেমন করে উঠল, তিনি চেঁচিয়ে বললেন—শীগ্‌গীর কেউ একটা গাড়ী ডেকে দাও—আহা বেচারা!

একটা গাড়ী এলে পর অলিভারকে তাতে তুলে ব্রাউনলো মশাই গৃহাভিমুখে গমন করলেন।

—নয়—

কয়েকদিন কেটে গেল, তবুও অলিভারের জ্ঞান হ'ল না। সূর্য্য উঠছে, ডুবছে, আবার উঠছে, রাত্রি আসছে—এমন করেই সময় গড়িয়ে চল্‌ল, তথাপি অলিভারের চৈতন্য নেই। প্রবল জ্বরে সে একেবারে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে।

অবশেষে এক সময় সে কাতরভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল—এ আমি কোথায় আছি? কোথায় আমায় আনা হয়েছে? আমি ত এই জায়গায় ঘুমিয়ে পড়িনি!

অলিভারের জ্ঞান হয়েছে দেখেই তাড়াতাড়ি একজন প্রৌঢ়া নারী বিছানার ধারে ঝুঁকে পড়ে বললেন—লক্ষ্মীটি, চুপ করে শুয়ে থাক, কথা কোয়ো না। কথা কইলেই আবার অসুখ বেড়ে যাবে। তারপর তার কপালের ওপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে বললেন—কী চমৎকার ছেলে গা। আহা! ওর যদি মা এ সময় ওর কাছে থাকতো!

সে-রাত্রিটা এক রকম কেটে গেল। পরের দিন অলিভার যেন আরও একটু সুস্থ বোধ করলে।

তিন দিন বাদে অলিভার দুর্ব্বল হ'লেও বিছানায় উঠে বসতে সমর্থ হ'ল। মিসেস্ বেড্‌উইন্ সর্ব্বদা তার কাছে কাছে থেকে সেবা করতে লাগলেন। অলিভার বিনীতভাবে জানালে—আপনি

আমাকে খুব দয়া করেছেন। তারপর সামনের একটা ফটো দেখিয়ে শুধোলে—বেশ ফটো ত। ওটা কার ছবি ?

—কি জানি আমি ঠিক জানি না।

ব্রাউনলো মশাই তাকে দেখতে এসে এ কথা সে কথার পর জিগেস করলেন—তোমার নাম কি ?

—আমার নাম অলিভার।

—অলিভার! অলিভার কি ? অলিভার হোয়াইট্ ?

—আজ্ঞে না, অলিভার টুইষ্ট্।

—আশ্চর্য্য নাম ত। কিন্তু তুমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তোমার নাম হোয়াইট্ বলেছিলে কেন ?

—আজ্ঞে না, আমি বলিনি।

ব্রাউনলো মশাই ভাবলেন যে, হয় ত বা কোন ভুল হ'য়ে থাকবে। কিন্তু তিনি যতই অলিভারের মুখের পানে তাকাতে লাগলেন ততই যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল এ মুখ যেন তিনি কোথায় দেখেছেন। তারপর হঠাৎ একবার সামনের ছবির দিকে চোখ পড়তে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করে বললেন—দেখ—দেখ, মিসেস বেড্উইন্ কী আশ্চর্য্য সাদৃশ্য !

এ দিকে হ'ল কি লোকজনের ভীড় বাড়তেই অলিভারের সঙ্গের দু'জন ত' আস্তে আস্তে সরে পড়ল। তারপর একদমে চোঁ-চাঁ দৌড়ে তারা বুড়োর বাড়ীর কাছাকাছি এসে খুব খানিকটা হেসে উঠল। একজন ত হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে—হা-হা,

বেটাকে কি রকম ঠকিয়েছি। অলিভারটা কী বোকা! নিজের দোষেই মরল।

আর একজন কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হ'তে পারলে না। বললে—না ভাই, আমার ভয় করছে।

—কেন রে?

—বুড়ো কি বলবে বল দেখি?

—নে নে, কী আবার বলবে!

মুখে সাহস দেখালেও মনে মনে দু'জনেরই ভয় হয়েছিল। তাই শঙ্কিত হৃদয়ে ঘরে ঢুকতেই বুড়ো আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে—কিরে, তিনজন গেছলি, দু'জন কেন? অলিভার কোথায়?

কেউ কোন জবাব দিলে না, দু'জনে কেবল মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল।

ইহুদি-বুড়ো তখন একজনের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে—বল্ শীগ্‌গীর, তা' না হ'লে তোকে আজ খুন করে ফেলব।

সে তখন চীৎকার করে উঠল—ওরে বাপরে, বলছিরে। সে ধরা পড়েছেরে।

তার চীৎকার শেষ হ'তে না হ'তে অপরটা ভাবলে হয় ত এবার তার ওপর তাল পড়বে। তাই সে আগে থাকতেই ধপাস্ করে পড়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল—উরে গেলুম রে, মেরে ফেল্‌লেরে।

বুড়ো ত রেগে আগুন। তখন বুড়োর সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তির যেন দক্ষযজ্ঞ চলতে লাগল। ভাগ্যিস্ সে সময় একজন মোটা মতন হাঁড়ি-মুখো লোক এসে পড়ল তাই রক্ষে, নইলে কি যে হ'ত

বলা যায় না। তাকে দেখেই বুড়ো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বললে —এস সাইক্স্, তারপর কি মনে করে?

আগন্তুক বললে—কি করছ ফ্যাগিন্; ওদের মারছো কেন?

—মারব না? বেটাদের জিম্মায় একটা ছোঁড়াকে ছেড়ে দিলুম, তা' সেটাকে কিনা ধরা পড়িয়ে ছাড়লে। এখন সে যদি কিছু ফাঁস করে দেয় তখন শুধু ত আমি মরব না, তোমরাও ত সব ধরা পড়বে।

কথা শুনে সাইক্সের মুখখানা একেবার ফ্যাকাসে মেরে গেল। সে তখন বসে পড়ে দু'চার গ্লাস টেনে নিয়ে বললে—তাহ'লে এখন কি করা যায়?

—কি আর করা যাবে! যদি সে জেলে গিয়ে থাকে তাহ'লে ভালই, নইলে সে কোথায় আছে আমাদের খুঁজে বার করতে হ'বে।

এখন কথা উঠল যে কে খুঁজতে বেরোবে। ফ্যাগিন্, সাইক্স্, কিংবা দলের অন্য কারো পক্ষে থানার ত্রিসীমানায় যাওয়াও নিরাপদ নয়, অথচ সেইখান থেকেই প্রথম খোঁজ নিতে হ'বে। বুড়ো তখন আদরের সুরে একটা মেয়ের দিকে চেয়ে বলে উঠল— লক্ষ্মী মেয়ে আমার, নান্সী, তুমি এইবার উদ্ধার করো।

নান্সী মাথা নেড়ে জানালে—ওরে বাপরে, আমি পারব না।

কিন্তু অনেক কাকুতি-মিনতি, অবশেষে ধমকানির পর সে যেতে রাজী হ'ল। তখন তাকে ছদ্মবেশে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল, তার যেন ভাই হারিয়ে গেছে, আর সে যেন কাঁদতে কাঁদতে তাকে খুঁজতে বেরোচ্ছে। কেমন ধারা করে কাঁদবে এবং কীই বা

বলবে তার সে একবার রিহার্স্যাল্‌ও দিয়ে নিলে। সকলে তখন তাকে তারিফ করে বললে—বাঃ বাঃ, তুমিই ঠিক পারবে।

নান্সী সোজা গিয়ে থানায় উপস্থিত হ'ল। পেছন দিক দিয়ে ঢুকে প্রথমে সে হাজতের আসামীদের কাছ থেকে খবর নিলে। তারা সকলেই জানালে যে না অলিভার বলে কেউ সেখানে নেই।

তখন সে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে কর্ম্মচারীকে জিগেস করলে—ওগো বাবুরা, আমার অলিভার কোথায় গেল ?

কর্ম্মচারীটি ওর কান্না শুনে দয়া-পরবশ হয়ে জানালে যে অলিভার ত এখানে নেই, সেই ভদ্রলোক দয়াপরবশ হ'য়ে তাকে বাড়ী নিয়ে গেছেন।

—কোন্ ভদ্রলোক, বাবু—কোন্ ভদ্রলোক ?

কর্ম্মচারীটি তখন যতটুকু জানত ততটুকু বল্‌লে।

নান্সী তখন যেন কতই দাগা পেয়েছে এ রকম ভাব দেখিয়ে আস্তে আস্তে ফটক পর্য্যন্ত এলো। সেখান থেকে একেবারে দে ছুট্।

সাইক্‌স্ তখনো বসেছিল, নান্সীর কাছ থেকে খবর শুনে সে যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল। ইহুদি বুড়ো নান্সীর পিঠ চাপড়ে বললে—তোমায় আর একটু করতে হ'বে লক্ষীটি, যে রকম করে হোক, তাকে—বুঝলে ত ?

নান্সী কোন কথা কইছে না দেখে সে বাক্স থেকে অনেকগুলো টাকা বার করে দেখিয়ে জানালে—এই তোমার পুরস্কার। কাজ হাসিল কর।

—দশ—

অলিভার সেরে উঠেছে। এখন তাকে আর তার সেই ছেঁড়া কাপড়-জামা পরতে হয় না। মিষ্টার ব্রাউনলো দরজী ডাকিয়ে তার জন্যে ভাল কাপড়-জামা তৈরী করিয়ে দিয়েছেন।

শোবার ঘরে শিয়র দিক থেকে সেই ফটোখানাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সে একদিন মিসেস্ বেড্উইন্‌কে জিগেস করলে —আচ্ছা, সেই ছবিখানা কোথায় গেল?

— মিষ্টার ব্রাউনলো সেখানা খুলে রেখে দিয়েছেন।

—কেন?

—তাঁর ধারণা ওখানা ওখানে থাকলে তোমার কষ্ট হতে পারে, হয়ত তাড়াতাড়ি অসুখ না সারতে পারে।

সে বলে উঠল—না-না, কষ্ট কিসের! বেশ ছবিখানা ছিল

দিন বেশ আনন্দে কেটে যায়।

একদিন মিসেস্ বেড্উইন্ অলিভারকে ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করে চুল আঁচড়ে দিয়ে বললেন—যাও, বৈঠকখানায় ব্রাউনলো মশায়ের সাথে দেখা করে এসো।

অলিভার খুশী হয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজায় আস্তে ধাক্কা

দিলে। মিষ্টার ব্রাউনলো তাকে ডাকতেই সে ভেতরে গিয়ে যেন একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। চার ধারে রাশি রাশি বই, যেন একেবারে বইয়ের পাহাড়। তাকে বিস্মিত হ'তে দেখে তিনি বললেন—কি অলিভার, অনেক বই, না?

—আমি কখনো এত বই দেখিনি।

—তুমি যদি ভাল ছেলে হও ত এ সমস্তই তুমি পড়তে পাবে।

—হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই ভাল ছেলে হ'ব।

মিষ্টার ব্রাউনলো তখন তাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—দেখ অলিভার, এবার আমি যা বলব তা তুমি খুব মন দিয়ে শোন।

তাঁকে অমন গম্ভীর বিষয়ের অরতারণা করতে দেখে অলিভার ভাবলে বুঝি তিনি তাকে পরিত্যাগ করবার কথা বলতে যাচ্ছেন। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন না।

—না-না অলিভার, তুমি যদি অন্যায় না কর ত তোমায় কেন তাড়িয়ে দেব!

—দেখবেন, কখ্খনো আমি অন্যায় কর্ব না।

—হ্যাঁ, জীবনে অনেকবার প্রতারিত হ'লেও তোমাকে অবিশ্বাস করতে মন চায় না। যাদের আমি ভালবাসতাম তারা সব একে একে পৃথিবীর দেনা-পাওনা মিটিয়ে চলে গেছে কিন্তু তবুও আমার হৃদয় আজো পাষাণ হ'য়ে যায়নি।

ভদ্রলোক এই কথাগুলো বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে

আবার আরম্ভ করলেন—অলিভার, তোমায় এসব বললাম এই জন্যে যে তুমি আমায় কখনো ব্যথা দেবে না। এখন তোমার বিষয় কিছু বল ত? কোথা থেকেই বা তুমি এলে? কেই বা তোমায় লালন-পালন করেছিল? আমি যে অবস্থায় তোমায় পেলাম, সে-অবস্থায়ই বা তুমি কি করে গিয়ে পড়েছিলে?

অলিভার সমস্ত ঘটনা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রুদ্ধ কান্নায় তার গলার স্বর যেন বন্ধ হ'য়ে গেল। ঠিক সেই সময় চাকর এসে জানালে যে মিষ্টার গ্রিম্‌উইগ্ এসেছেন।

ব্রাউনলো মশাই তখন অলিভারকে বললেন—গ্রিম্‌উইগ্ আমার বন্ধু, সে যদি কঠোর কিছু বলে ত' তুমি যেন কিছু মনে কোরো না, ওর স্বভাবই ঐ রকম।

—আমি কি নিচে যাব?

—না-না, তুমি এখানেই থাক।

গ্রিম্‌উইগ্ ঢুকলেন। মোটা-সোটা ভদ্রলোক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক, ওয়েষ্ট্‌কোটের পকেট থেকে একটা লম্বা চেন ঝোলানো। ঘরে ঢুকেই অলিভারকে দেখে তিনি দু'পা পিছিয়ে যাবার মত করে বলে উঠলেন—আরে এ আবার কে?

—যে ছেলেটির কথা তোমায় বলেছিলাম, সেই ছেলেটি।

অলিভার প্রণাম করলে। তিনি বললেন—সেই ছেলেটি! যার জ্বর হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কিহে খোকা, এখন কেমন আছ?

—ভাল আছি সার্।

ব্রাউনলো মশাই ভাবলেন হয়ত এবার তাঁর বন্ধু ওকে অপ্রিয় কিছু জিগেস করবে। তাই তাড়াতাড়ি তিনি অলিভারকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বন্ধুকে শুধোলেন—ছেলেটিকে বেশ দেখতে, নয়?

—জানি না।

—জানো না কি রকম!

—না। ছেলেদের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখতে পাই না। আমি খালি দু' রকমের ছেলে জানি, প্রথম হ'ল মেনিমুখো ছেলে, আর দ্বিতীয় হ'ল পেটুক ছেলে।

—অলিভার কোন্ শ্রেণীর? তার ও দুটোর কোন লক্ষণই নেই বোধ হয়!

—নেই! তার চেয়ে বেশী আছে। কোত্থেকে ও এল? কি জাতের ছেলে? জ্বর হয়েছিল ত তাতে কি? জ্বর ত বদ্মাইস্ লোকদেরই বেশী হয়। আমি ত একজন খুনীকে জানি, জ্যামাইকাতে ফাঁসীর আগে যার ছ' বার জ্বর হয়েছিল। তা' বলে ত তার আর ফাঁসী বন্ধ হয় নি!

দুই বন্ধুতে এম্নি কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময়ে মিসেস্ বেড্উইন্ একটা বইয়ের পার্শেল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ব্রাউনলো মশাই বইগুলো সেই পূর্ব্বেকার বইয়ের দোকান থেকে কিনে রেখেছিলেন। বইগুলো খুলেই তিনি বললেন—যে ছেলেটি এগুলো এনেছে তাকে ডাকো ত।

—সে যে চলে গেছে।

—না-না, একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে ডেকে আন। দাম চুকিয়ে দিতে হবে আর খান-দুই বই ফেরৎ যাবে।

দরজা খুলে অলিভার খুঁজতে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললে যে দেখা পাওয়া গেল না।

—আহা, পেলে বড় ভাল হ'ত।

বন্ধুটি অমনি বলে উঠলেন—কেন, অলিভারকেই পাঠাও না।

মিষ্টার ব্রাউনলো তখন বললেন—আচ্ছা তুমিই যাও!

অলিভার তখন বইগুলো নিয়ে গিয়ে কি বলতে হ'বে শোনবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল

—তুমি গিয়ে বলবে যে এই বইগুলো ফেরৎ দিলেন। আর এই তার সাড়ে চার পাউণ্ড দাম দিয়ে দেবে। তোমায় এই পাঁচ পাউণ্ডের একখানা নোট দিচ্ছি, তুমি দশ শিলিং ফেরৎ আনবে।

—আমার দশ মিনিটও লাগবে না দেখবেন।. বলে অলিভার বেরিয়ে গেল

বন্ধু জিগেস করলেন—তুমি কি আশা কর যে ও আবার ফিরবে?

—তুমি কী বলছো গ্রিম্‌উইগ্!

—বলছি এই যে ছোঁড়া নতুন পোষাক পেয়েছে, দামী দামী বই পেয়েছে, তার উপর আবার পাঁচ পাউণ্ডের নোট—ও কি আর ফিরবে? সেই চোরের দলে গিয়ে ভিড়বে।

মিষ্টার ব্রাউনলো কোন জবাব দিলেন না। দুই বন্ধুতে চুপটি করে বসে রইলেন,—মাঝখানে ঘড়িটা শুধু টিক্ টিক্ করে সময়ের অন্তর্দ্ধান জানিয়ে চল্‌লো।

—এগারো—

ইতিমধ্যে অলিভার পথ ভুল করে সেই নোংরা পল্লীর মধ্যেই এসে পড়েছে। তার মনে মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু সন্দেহ হয়নি যে সে ইহুদিবুড়োর আস্তানার এত কাছে এসে পড়বে। বগলে তার সেই বইগুলো, পকেটে নোট, নানা রকম সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে পথ চলেছে ; এমন সময় একজন যুবতী 'ওরে আমার ভাইরে' বলে তার ওপর এসে পড়ল। সে চোখ ফিরিয়ে ব্যাপার কি দেখতে-না-দেখতেই আগন্তুক দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে।

অলিভার বলে উঠল—তুমি আমায় আট্‌কাচ্ছ কেন? আমায় যেতে দাও।

এর উত্তরে মেয়েটি পুনর্ব্বার সেই রকম বিলাপ করে চেঁচাতে লাগল। ওরে ধন আমার, তোকে আমি এবার পেয়েছি। ওরে অলিভার, কী দুষ্টু ছেলেরে তুই! দিদিকে একলা ফেলে কোথায় পালিয়ে ছিলিরে? ওরে মাণিক আমার, কত খুঁজে খুঁজে তোকে পেয়েছি, আর ত' তোকে ছাড়বো নারে।

তার ঐ উচ্চ বিলাপে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল।

অলিভার এবার মেয়েটির মুখ দেখতে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—এযে নান্সী!

একজন লোক অলিভারকে খিঁচিয়ে উঠ্‌লো—এই পাজী, বাড়ী যা'না।

অলিভার চেঁচিয়ে উঠল—আমার বাড়ী নেই, আমি ওর কেউ নয়। আমায় ছেড়ে দাও।

কিন্তু অলিভারের কোন কথা কেউ শুনলে না। লোকটা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে চললো।

সে-লোকটি আর কেউ নয়, সে হচ্ছে সাইক্স্।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে যখন তাকে ফ্যাগিনের কাছে আনা হ'ল, তখন তার সেই পূর্ব্বেকার সঙ্গীটি হেসে বললে—এই যে! চাঁদ যে আবার ফিরে এসেছে।

ফ্যাগিন কৃত্রিম ভালবাসার সুরে জানালে—কোথায় গেছলে ধন, কেন আমায় চিঠি লেখনি? তোমার জন্যে আমরা কত ভাব্‌ছি।

তার কথায় সবাই হেসে উঠ্‌ল। সাইক্স্ তখন তার পকেট থেকে সেই পাঁচ পাউণ্ডের নোটখানা টেনে বার করে বললে—বাহারে! এ আবার কি? এ আমার কিন্তু ফ্যাগিন্।

—না না সাইক্স, ও আমার। তুমি বরঞ্চ বইগুলো নাও।

—বই নিয়ে কি হ'বে? ও যদি আমায় না দাও ত আমি অলিভারকে আবার ফিরিয়ে রেখে আসব।

বুড়ো ইহুদি এতে যেন একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, তুমিই নাও।

অলিভার তখন মিনতি করে জানালে—ও টাকা আর বই

তোমরা নিও না, আমি এক ভদ্রলোকের হ'য়ে ওগুলো দোকানে দিতে যাচ্ছি।

তার কথায় কেউ কান দিলে না। তার সেই পূর্ব্বেকার সঙ্গীটি একেবারে হেসে লুটোপুটি খেয়ে বললে—ওরে বাবারে, অলিভার যে একেবারে ভদ্রলোক বনে গিয়েছে!

বুড়ো ইহুদি আবার তাকে আদর জানিয়ে বললে—বাবা আমার, এতদিন কোথায় ছিলে ধন?

অলিভার কাকুতি করে জানালে—আমায় ফিরিয়ে দিয়ে এস। তা' না হ'লে ভদ্রলোক ভাববেন যে আমি তাঁর টাকা চুরি করে পালিয়েছি। তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমায় আটকে রেখো না।

ফ্যাগিন্ এবার তার সুর পাল্টে বললে—আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেছিলিস্ নয়? পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিবি ভেবে ছিলিস্? দাঁড়া, তোর ঠিক যোগ্য দাওয়াই দিচ্ছি। বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে লাঠি দিয়ে তার পিঠে এক ঘা কষিয়ে দিলে। আর এক ঘা কষাতে যাচ্ছিল, নান্সী পেছন থেকে লাঠিটা ধরে ফেলে বললে—আমি থাকতে ওকে মারতে দেব না।

ওর এই দৃঢ়তা দেখে বুড়ো যেন একটু ভয় পেলে, তাই সে আর কিছু না বলে আড়চোখে একবার সাইক্সের দিকে চাইলে। সাইক্স্ বলে উঠল—তোর অত দরদ কেন বল্ ত? তোর এই দরদ ঘুচিয়ে দিতে পারি জানিস্!

-যা খুশী তাই আমায় করো, আমি ভয় করি না। কিন্তু

আমার মনে হচ্ছে এই চোরের আড্ডায় ও বাছাকে এনে আমি ভাল কাজ করি নি।

ফ্যাগিন্ এর উত্তরে একটা ঘৃণার ভঙ্গী করে' বললে—মেয়েদের একাজে আনাই ভুল, অথচ গোটা কতক কাজ ওদের দিয়ে না হ'লে আবার হয়ই না। চার্লি, অলিভারকে শুতে নিয়ে যাও।

চার্লি তখন অলিভারকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে গেল। আর অলিভার সেই অন্ধকারে একলা পড়ে থেকে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়্ল।

এদিকে বাম্বল্‌মশাই অনাথ আশ্রমের এক মামলা চালাতে লণ্ডন যাত্রা কর্‌লেন। লণ্ডন পৌঁছে স্নানাহার সেরে, খবরের কাগজ খুলতেই প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি এই বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হ'ল—

পাঁচ গিনি পুরস্কার

"অলিভার টুইষ্ট্ নামে একটি বালক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হ'তে নিরুদ্দেশ হয়েছে যে কেউ তার সম্বন্ধে কোন সন্ধান, কিংবা তার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে পারবে, সে-ই উক্ত পুরস্কার পাবে।"

তারপর অলিভারের সমস্ত বর্ণনা ও মিষ্টার ব্রাউনলোর ঠিকানা দেওয়া আছে।

বাম্বল্ বার কতক সেইটা পড়েই তক্ষুনি ব্রাউনলোর বাড়ীর দিকে ছুটলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে সেখানে পৌঁছে ডাক্লে—ব্রাউনলো মশাই কি বাড়ী আছেন?

একটি বালিকা বেরিয়ে এসে বললে—আপনি কোত্থেকে আসছেন?

বাম্বল্ অলিভারের নাম করতেই তাকে মিষ্টার ব্রাউনলোর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

মিষ্টার ব্রাউনলোর পাশে তাঁর সেই বন্ধুটি বসেছিলেন, তিনি কি বলতে যেতেই ব্রাউনলো মশাই বলে উঠলেন—এখন বিরক্ত কোরো না। তারপর বাম্বলকে বললেন—আপনি বসুন না।

বাম্বল্ বসে পড়ল। ব্রাউনলো মশাই জিগেস করলেন—আপনি বিজ্ঞাপন দেখে আসছেন নয়?—অলিভারের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

বাম্বল্ তার উত্তরে যা জানালে তার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই যে, অলিভার ছেলেবেলা থেকেই একটা পাজী বদ্‌মাইস্, নীচ বংশে তার জন্ম, একটা ছেলেকে খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে সে পালিয়ে এসেছিল।

মিষ্টার ব্রাউনলো তখন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—এগুলি যদিও তার নিরুদ্দেশের সংবাদ নয়। তবুও আপনি যদি অন্য কিছু বলতেন ত আমি আপনাকে এর তিনগুণ পুরস্কার দিতুম।

বাম্বল মনে মনে আপশোষ করতে লাগ্‌ল—আহা, যদি সে আগে জানত যে বুড়ো অন্য কিছু শুনতে চায় তাহলে না হয় র

চড়িয়ে অপর কিছু বলা যেত। যাই হোক্ পাঁচ গিনি পকেটে ফেলে সে সরে পড়ল।

ব্রাউনলো মশাই তখন গম্ভীর ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। অবশেষে মিসেস্ বেড্উইন্কে ডেকে বললেন—অলিভার একজন জোচ্চোর।

—না না, সে কখনো তা' হতে পারে না।

—হ'তে পারে না কি, আমরা যে তার সমস্ত ইতিহাস শুনলুম।

—আমি তা কখনো বিশ্বাস করব না।

বন্ধুটি মন্তব্য করলেন—মেয়ে মানুষরা ত কিছুই বিশ্বাস করে না, তারা বিশ্বাস করে খালি উপন্যাসের গল্প।

—না না, তা নয়। অলিভার কখনো ওরকম হ'তে পারে না।

মিষ্টার ব্রাউনলোকে কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করানো গেল না। তিনি বলে উঠলেন—আজ থেকে কোন ছলে আর কেউ আমার কাছে অলিভারের নাম পর্য্যন্ত করবে না—এই আমার আদেশ।

—বারো—

পরের দিন অলিভার ঘুম থেকে উঠতেই বুড়ো ইহুদি তার কাছে এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লে যে অলিভার তার কাছ থেকে চলে গিয়ে অকৃতজ্ঞের কাজ করেছে ; সে এখানে যদি মন দিয়ে কাজকর্ম্ম করে ত' সে বেশ সুখে থাকবে। তারপর সে একটি ছেলের বিবরণ দিলে। সে ছেলেটী এখান থেকে তারই মত পালিয়ে গেছল কিন্তু পরে তার ফাঁসী হয়েছিল, আর ফাঁসী হওয়ায় যে কি কষ্ট তা' আর বর্ণনা করা যায় না। এই রকম পাঁচ রকম করে তাকে বুঝিয়ে বুড়ো তাকে আবার চাবি দিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল।

এই রকম ভাবে কয়েকদিন বন্ধ থাকবার পর তবে অলিভার বাড়ীর মধ্যে ঘুরে বেড়াবার জন্য মুক্তি পেলে। বাড়ীটা নোংরামীর চূড়ান্ত, এখানে মাকড়সার জাল, ওখানে ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবুও এতদিন আটক থাকবার পর অলিভার সেই সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েও আনন্দ পেলে।

একদিন হ'ল কি, বিকালে ডজার বলে একটি ছেলে অলিভারকে জুতো ঝেড়ে দিতে আদেশ করলে। অলিভার কাজ পেলেই খুশী, সে তাই করতে লাগল। তখন ডজার চার্লিকে ডেকে বললে —ছোঁড়াটা কি যেন, ও-ও ত' আমাদের মত হ'তে পারে।

অলিভার সেটা শুনতে পেয়ে জবাব দিলে—তোমরা ত' এক একজন—

—শুধু আমরা কেন, সবাই। নান্সী, সাইক্স্, ফ্যাগিন্ সব্বাই ত। তুই-ও কেন তাই হ'না।

—আমার ও ভাল লাগে না। আমায় বরঞ্চ তোমরা ছেড়ে দাও।

—ফ্যাগিন্ তোকে ছাড়বে না। তারপর পকেট থেকে অনেকগুলো টাকা পয়সা বার করে সে বললে—এই ত আমাদের এত আছে। আমরা এসব কোত্থেকে পাই? তুইও আমাদের মত হ'লে পেতিস্।

—না, ও খারাপ কাজ।

—আহা! খারাপ কাজ! বাজে বকিস্ নি। মিছেমিছি সময় নষ্ট না করে ফ্যাগিনের কাজে লেগে যা, উন্নতি হবে।

বুড়ো সেই সময় ঢুকে পড়ে শেষের কথাগুলো শুনতে পেয়ে বললে—ঠিকই ত।

সেই থেকেই ওই দুটো ছেলে তাকে অনেক করে বোঝায় আর মন ভোলাতে চেষ্টা করে। বুড়ো তাকে কাছে ডেকে নানান্ রকম প্রলোভন দেখায়।

একদিন রাত্রে বুড়ো সাইক্সের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

বুড়ো আস্তে আস্তে কি বলতেই সাইক্স্ জানালে—হ'বে না।

—হবে না কিহে? এতদিন ধরে চেষ্টা করে শেষকালে—

—কি করব? বরাত মন্দ।

বুড়ো তখন তাকে নানান্ রকম করে বোঝাতে লাগল। সাইক্স্ তখন একটু নরম হয়ে বললে—আরও বেশী দিতে হবে।

—দর করছো নাকি?

—দরের কথা হচ্ছে না, তুমি ত জানো বাগান পেরুলেই যে জানলা আছে তা' দিয়ে আমরা ঢুকতে পারব না। সুতরাং একটা ছোট ছেলে চাই।

—একটা ছেলে!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ।

তখন বুড়ো একটু যেন ইতস্ততঃ করতে লাগল। এমন ভাব দেখালে যে নান্সী উপস্থিত থাকলে সে ওসব কথা কি করে খুলে বলে।

—ও থাকলেই বা, তুমি বলো না।

নান্সী বলে উঠ্‌ল—আমি জানি ও কি বল্‌বে।

বুড়ো তবুও ইতস্ততঃ করতে লাগল।

—কি, তোমার কী হ'ল? বলই না।

—না বলছি, তবে আবার যদি নান্সী সেদিনকার মত ক্ষেপে যায়।

নান্সী তখন হেসে উঠে বল্‌লে—তুমি অলিভারের কথা বলতে ভয় পাচ্ছ ত'? সে আমি আগেই বুঝেছি।

বুড়ো তখন আদর করে তাঁর পিঠ চাপড়ে বললে—হাঁ-হাঁ, তুমি বুঝবে না, তুমি কতো বুদ্ধিমতী! তোমার মত মেয়ে কি আর আছে। আমি অলিভারের কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।

সাইক্‌স্ জিগেস করলে—তার কথা কেন ?

—তুমি যে ছেলের কথা বল্‌ছ, তাকে দিয়েই তার কাজ সারা যাবে।

নান্সী বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ সাইক্‌স্, তুমি তাকে নাও!

ফ্যাগিন্ নান্সীর খোঁচাটা ধরতে না পেরে বললে—হ্যাঁ, তাকে দিয়েই হ'বে। তা' ছাড়া অন্য ছেলেগুলো বড্ড বড়।

—তা' হ'লে কবে কাজ হাসিল হচ্ছে ?

—কেন পরশু, সেদিন অন্ধকার রাত্রি থাকবে।

—তাহলে কালকেই ছেলেটাকে নিয়ে এস। তাকে ত আবার তালিম দিয়ে রাখতে হ'বে।

তখন ঠিক হ'ল যে নান্সী বুড়োর কাছ থেকে ছেলেটাকে নিয়ে আসবে, এবং তারপর অলিভার সাইক্সের জিম্মায় থাকবে। কাজ হাসিল করতে গিয়ে যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে ত সাইক্স্ তার জন্যে দায়ী হ'বে না।

এই রকম ঠিক করে বুড়ো বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরল। সারা পথ সে ভাবতে ভাবতে গেল কী করে কাজ উদ্ধার হ'বে এবং কত টাকা পাওয়া যাবে। বাড়ী পৌঁছেই সে খবর নিয়ে জানলে যে অলিভার ঘুমিয়েছে। কাজেই পরের দিনের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হ'ল।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই অলিভার তার পাশে নতুন জামা-জুতো দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। প্রথমে ভাবলে হয়ত বা, তাকে ছেড়েই দেওয়া হ'বে তাই এই আয়োজন। তার

মনের মধ্যে বেশ একটা আনন্দ হ'ল। কিন্তু খানিকটা যেতেই তার সমস্ত আনন্দ ম্লান হ'য়ে পড়ল! বুড়ো এসে তাকে বললে যে সাইক্সের বাড়ীতে তাকে নিয়ে যাওয়া হ'বে।

অলিভার ভয়ে ভয়ে জিগেস করলে—সেই খানেই কি আমি থাক্‌ব?

—না না বাপ্ আমার। তোমাকে কি আমরা সেখানে রাখতে পারি! তুমি আবার ফিরে আসবে।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে—কেন নিয়ে যাওয়া হ'বে তা জানবার জন্যে তোমার বড় কৌতূহল হচ্ছে, না?

অলিভার জানালে—হ্যাঁ।

—কেন বলতে পার?

—আমি কি করে জানব!

বুড়ো তখন একটু হেসে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, সাইক্স্ তোমায় সব বলবে'খন। তারপর একটু থেমে জানালে—সে যা বলে শুনো। একটু বদ্‌মেজাজী সে, যেন তার কথার অবাধ্য হোয়ো না। বলে সে চলে গেল।

অলিভার তখন একা ভাবতে বসল যে কী জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভেবে সে কোন কূল-কিনারা পেলে না। তার ভয় করতে লাগল, কেমন যেন মনে হ'তে লাগল যে হয়ত কোন অমঙ্গলের মধ্যে এরা তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চায়। তাই সশঙ্কিত চিত্তে হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলে। যুক্তকরে মিনতি জানালে—হে ঠাকুর,

তুমি আমায় রক্ষা কোরো। দেখো যেন আমার কোন বিপদ না ঘটে।

তার প্রার্থনা শেষ হ'তেই সে তার চারপাশে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর শব্দ শুনতে পেলে। সে সভয়ে চীৎকার করে উঠল—কে?

একটা স্বর যেন উত্তর দিলে—আমি।

অলিভার আলোটাকে তুলে ধরে দেখলে যে নান্সী এসে দাঁড়িয়েছে।

অলিভার উদ্বিগ্ন হ'য়ে প্রশ্ন করলে—আমায় কি তোমার সঙ্গে যেতে হ'বে?

—হ্যাঁ। সাইক্স্ আমায় পাঠিয়েছে আমিই তোমায় নিয়ে যাব।

অলিভার তখন একবার ভাবলে যে এই মেয়েটির কাছে সে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে কৃপাভিক্ষা করে। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে সে বলে উঠল—আমি প্রস্তুত।

নান্সী তার মনের ভাব কতকটা আন্দাজ করে বললে—তোমার চার ধারে বেড়া দেওয়া, অলিভার, লক্ষ্মীটি, এ সময়টা পালাতে চেষ্টা কোরো না। তুমি যদি পালাও তা হ'লে আমার আর নিস্তার থাকবে না।

এই বলে অলিভারের হাত ধরে নান্সী বেরিয়ে পড়ল। সারা রাস্তা সে তাকে বোঝাতে লাগিল। অলিভারের একবার ইচ্ছে হ'ল যে রাস্তাব যে কোন লোককে ডেকে সে সমস্ত বলে, কিন্তু নান্সীর বিপদের কথা ভেবে সে নিরস্ত হ'ল।

বাড়ী পৌঁছে নান্সী অলিভারকে দেখিয়ে বললে—এই নাও সাইক্স্।

সাইক্স্ একবার অলিভারের পানে আড় চোখে তাকিয়ে বললে—রাস্তায় ও কোন গোলমাল করেনি ত?

—না।

—শুনে আনন্দিত হ'লুম।

তারপর সে একটা পিস্তল পকেট থেকে বার করে অলিভারকে দেখিয়ে জিগেস করলে—এটা কি জানো?

অলিভার উত্তর দিলে যে, হ্যাঁ সে জানে।

—তাহলে এই দেখ। এই হল বারুদ, এই গুলি, আর এই যে টুপিটা দেখছো, এটাকে ছেঁদা করতে হবে। দেখে রাখ, এটাকে 'লোড' করা হল।

অলিভার মাথা নেড়ে জানালে যে সে দেখছে।

তখন সাইক্স্ পিস্তলটা তার কপালের কাছে ঠেকিয়ে বললে—আমার সঙ্গে যখন বাইরে যাবে তখন আমার অনুমতি ছাড়া যদি টুঁ শব্দটি কর, কিংবা যদি বিগ্‌ড়বার কোন লক্ষণ দেখি তাহলে তোমায় একেবারে শেষ করে দেব।

অলিভার ভয়ে শিউরে উঠল।

—তেরো—

সারারাত্রি অলিভারের ভাল করে ঘুম হয়নি। ভোর বেলা সাইক্‌স্ তাকে ডেকে তুললে, তারপর কিছু প্রাতর্ভোজন করে নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। কুয়াসাচ্ছন্ন ধূসর প্রভাত, তার ওপর মাঝে মাঝে দু' এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে, ম্যাজমেজে প্রকৃতি। আগের রাত্রে খুব বৃষ্টি হওয়ার দরুণ রাস্তায় মধ্যে মধ্যে জল-কাদা জমেছিল, লোকে এখনও কেউ বেরোয় নি, দুপাশের প্রায় সব দরজা জানলা এখনো বন্ধ আছে।

খানিক দূর যাবার পর লোক চলাচল ক্রমশঃ সুরু হ'ল, দোকানপাটও খুলতে আরম্ভ করেছে। মেঘ্‌লা অন্ধকার কিন্তু তখনো মিলোয় নি, যদিও খানিকটা বেলা হয়েছিল। সাইক্‌স্ হন্ হন্ করে চলেছে, কোনদিকে তার দৃক্‌পাত নেই। কিন্তু তার পিছু পিছু গেলেও অলিভারের ঐ বিরাট জগতা ও বড় বড় প্রাসাদ দেখে কেমন যেন ঘোর লাগছিল। সেই জন্যেই সে পিছিয়ে পড়ছিল। সাইক্‌স্ তাকে একটা ধমক দিয়ে বললে—এই, সাতটা বেজে গেছে। পা চালিয়ে আয়, কুঁড়ের বাদশা কোথাকার।

আরও কিছুদূর তারা অগ্রসর হ'ল, অলিভার এতক্ষণ প্রায় তার পেছনে দৌড়চ্ছে আর কি! এবার রাস্তার মাঝখানে

তুই আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এই আলোটা নিয়ে বাইরের দরজা খুলেদে।

—পৃঃ ৭৬

একখানা ভাড়াটে গাড়ী দেখতে পেয়ে সাইক্‌স্ দূরবর্ত্তী একটা জায়গার নাম করে গাড়োয়ানকে বললে—এই, ভাড়া যাবি ?

গাড়োয়ান জবাব দিলে—উঠুন না বাবু, ওটি কি আপনার ছেলে ?

সাইক্‌স্ পকেটের পিস্তলটা দেখিয়ে ইঙ্গিত করে অলিভারের দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে জবাব দিলে—হ্যাঁ।

অলিভারকে হাঁপাতে দেখে গাড়োয়ান আবার বলে উঠল—তোমার বাবা খুব জোরে হাঁটে, না ?

সাইক্‌স্ কোন কথা না বলে অলিভারকে টেনে ভেতরে তুলতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে। রাস্তার ধারে বিভিন্ন পল্লী নির্দ্দেশকারী মাইল্‌ষ্টোন্ দেখে অলিভার এই ভেবে আশ্চর্য্য হ'ল যে, তার সঙ্গী তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু ভয়ে সে কোন কথা জিগেস করতে পারলে না, সারা রাস্তাই চুপচাপ চলল। অবশেষে গাড়ীটা এসে একটা সরাইয়ের কাছে থামল।

সাইক্স্ তাড়াতাড়ি অলিভারের হাত ধরে নাবালে, তারপর পকেটের পিস্তলটাকে ইঙ্গিত করে আবার তার দিকে একবার কট্‌মটিয়ে তাকালে। পরক্ষণেই গাড়োয়ানের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে। এ-রাস্তা সে-রাস্তা করে অনেক ঘুরে তারা একটা বহু পুরাতন সরাইয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়ে কিছু জলযোগে রত হ'ল। জলযোগের পর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে অলিভার ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ যে সে ঘুমিয়েছিল তা' তার মনে নেই, সাইক্সের

একটা ঠেলা খেয়ে জেগে উঠে দেখে যে সাইক্স একট গাড়োয়ানের সঙ্গে দর কষাকষি করছে। খানিকক্ষণ বচসার প সে রাজী হতে আবার তার গাড়ীতে উঠে অপর এক পল্লীর উদ্দেশে তারা যাত্রা করলে। তখন রাত হয়ে গেছে, অন্ধকার কুয়াসাচ্ছ রাত্রি। তার ওপর ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়ছে। অলিভার এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল, সাইক্সও কোন কথা কইলে না। বিরাট দৈত্যাকৃতি গাছগুলো অন্ধকারে পাশ দিয়ে একে একে যেতে লাগল, দূরে কোথা থেকে যেন একটা জলপ্রপাতের গভ শব্দ ভেসে আসছে। এরই মধ্যে দিয়ে আরও খানিকটা চলে এক জায়গায় এসে গাড়ীটা থামল। অলিভার ভেবেছিল যে এবার হয় ত কোন বাড়ীতে ঢুকবে, কিন্তু সাইক্স তাকে হাত ধরে নামিয়ে আবার হাঁটতে সুরু করলে। নির্জ্জন রাস্তা, দু' পাশে ফাঁকা মাঠ, তারই মধ্য দিয়ে দূরবর্ত্তী সহরের আলো দেখা যাচ্ছিল। আরও খানিকটা হেঁটে অলিভার দেখলে যে তারা একটা পোলের মুে এসে পড়েছে। এই নির্জ্জন পোলের উপর নিজেকে নিঃসহায় দেখে অলিভার ভাবলে হয়ত তাকে এখানে হত্যা করতে আনা হয়েছে, কিন্তু তার ভাবনা আর বেশীদূর অগ্রসর হতে-না হতেই তারা একটা জীর্ণ বাড়ীর সামনে উপস্থিত হ'ল। বাইরে থেকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না যে সেখানে মানুষ বাস করে তবুও সাইক্স তাকে নিয়ে তার ভেতরই ঢুকল।

তাদের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে টবি কাঁসার মত আওয় করে বললে—হ্যালো, সাইক্স যে ?

সাইক্স বিরক্ত হয়ে জানালে—গোল করো না বন্ধু, আলো দেখাও।

একটা মোমবাতির আলো অনুসরণ করে, তারা একটা নোংরা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে, ঘরটার মধ্যে একখানা টেবিল, দুখানা ভাঙা চেয়ার ও একটা ছেঁড়া কৌচ আছে। পূর্ব্ব কণ্ঠস্বর আবার বলে উঠল—সাইক্স, তোমায় দেখে আমি কতো সুখী হলুম। ভেবেছিলুম তুমি বুঝি এ ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ। তারপর অলিভারের দিকে চোখ পড়াতে সে জিগেস করলে—ওটা কে?

—একটা ছেলে, আবার কে!

—ফ্যাগিনের ছেলে বুঝি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কিছু খেতে-টেতে দেবে বল্‌তে পার? তারে আবার অলিভারের পানে তাকিয়ে সে বললে—এই ছোঁড়া, আগুনের ধারে বসে একটু জিরিয়ে তাজা হয়ে নে। আবার শীগ্‌গীরই বেরোতে হবে।

অনুচরেরা তখন খাবার ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি নিয়ে এল। টবি প্রথমে গেলাসে মদ ঢেলে সাইক্সকে দিলে। তারপর আর এক গ্লাস ঢেলে অলিভারের দিকে এগিয়ে দিতেই সে কাতরভাবে বলে উঠল—না—না—না—

টবি তখন চীৎকার করে উঠল—নে নে, আমি রেখে দে। তুই কি খাস না খাস আমরা জানি। সাইক্স, ওকে একগ্লাস খেতে বলাত।

সাইক্‌স্ তখন ধমকে বললে—খেয়ে নে না, ছোঁড়া।

ঐ দু'জনের এবম্বিধ তাড়া খেয়ে অলিভার তাড়াতা
গেলাসের জিনিসটা মুখের ভেতর ঢেলে দিলে। তারপর
চোটে ভয়ানক কাস্‌তে আরম্ভ করলে।

খাওয়া-দাওয়ার পর যে যার কম্বল মুড়ি দিয়ে একটু গড়ি
নিলে। ঝিমুনির মাঝে মাঝে অলিভারের মনে হ'তে লাগল যে
সে নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো জনাকীর্ণ রাস্তায়, কখনে
বা গীর্জ্জার প্রাঙ্গনে। হঠাৎ টবি তাকে জাগিয়ে বললে—এ
ছোঁড়া ওঠ্, রাত দু'টো বাজে। তার সাড়া পেয়ে আর সবাই
উঠে পড়ে তৎপর হ'ল। টবি আবার বললে—আমার পিস্ত
কোথায় রে কর্নি ?

—এই যে এখানে, ভর্ত্তি রয়েছে।

—আর সব যন্ত্র কোথায় ?

সাইক্‌স্ জবাব করলে—আমি সব নিয়েছি।

তারপর তারা অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল
ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, কুয়াসা আরও বেড়েছে। বৃষ্টি
পড়লেও কুয়াসার চোটে অলিভারের সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। শীঘ্র
তারা পোল পেরিয়ে সেই দূরবর্ত্তী সহরের আলোর দিকে এগু
লাগল। শেষের রাত্রি, তাই রাস্তায় জনপ্রাণীও নেই, কেউ
তাদের দেখতে পেলে না। প্রায় আধ-মাইলটাক্ হেঁটে তা
একটা পাঁচীল-ঘেরা বাড়ীর সামনে এসে পড়ল। এক লাফে
ওপর চড়ে উঠে টবি বললে—ছেলেটাকে তুলে দাও, আমি
ধরে নেব।

অলিভার চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই সাইক্‌স্ তাকে
:র তুলে দিলে এবং তিন চার সেকেণ্ড বাদে দেখা গেল যে—
ারা তিনজনেই পাঁচীলের ওপারে গিয়ে ঢুকেছে। চুপিচুপি পা
পে টিপে তারা বাড়ীর দিকে এগুতে লাগল।

এতক্ষণ বাদে অলিভার বুঝ্‌তে পারলে যে তাদের এই
ভিযানের উদ্দেশ্য হ'ল ডাকাতি করা! সে দু' হাত মুঠো করে
স্ফুটে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ করলে। চোখের সামনে
ার যেন কেবল কুয়াসাই ভেসে বেড়াতে লাগল, তার সর্ব্বাঙ্গ যেন
বশ হয়ে এসেছে, সে ধপ্ করে বসে পড়ল।

সাইক্‌স্ তখন রাগে কাঁপতে কাঁপতে পকেট থেকে পিস্তল
ার করে বললে—ওঠ্ ছোঁড়া, নইলে এইখানেই তোকে সাবাড়
রে দেব।

অলিভার ফুঁপিয়ে উঠল—ভগবানের দোহাই তোমরা আমায়
হড়ে দাও। আমি চুরি করতে পারব না।

সাইক্‌স্ দাঁত কড়মড় করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু
বি অলিভারের মুখ চেপে ধরে হেঁচ্‌ড়াতে হেঁচ্‌ড়াতে তাকে নিয়ে
তারপর জানলার কাছে গিয়ে থেমে বললে—চুপ্ ছোঁড়া,
থা কয়েছিস্ কি সাবাড় করে দিয়েছি।

জানলাটা ছিল ছোট্ট, একটা চাড় দিয়ে বাইরে থেকেই
সটাকে তারা খুলে ফেললে। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট
বার করে সাইক্‌স্ অলিভারকে বললে—আমি তোকে
ায়ে ভেতরে নাবিয়ে দিচ্ছি, তুই আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে

এই আলোটা নিয়ে বাইরের দরজা খুলে দে। তাহলেই আমরা ঢুকতে পারব। তারপর টবি জানালে—দরজার মাথায় একটা হুড়কো আছে, এম্‌নি তুই তার নাগাল পাবি না! একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়াবি।

কথা শেষ হবামাত্রই সাইক্‌স্ অলিভারকে জানলা গলিয়ে ভেতরে ফেলে দিলে। তারপর আলোটা দিয়ে বললে—এই নে, সামনে সিঁড়ি দেখছিস্ না?

অলিভার মড়ার মত ফ্যাকাসে মেরে গিয়ে জবাব দিলে—হ্যাঁ।

সাইক্‌স্ তাকে পিস্তল দেখিয়ে বললে—যা বলছি শীগ্‌গীর কর, নইলে এখনি তোকে গুলি করব।

অলিভার প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে ভাবলে যে সে মরে মরুক কিন্তু কিছুতেই চুরির সাহায্য করবে না। বরঞ্চ এই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সে লোকদের জাগিয়ে দেবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল।

হঠাৎ একটা কি আওয়াজ হতেই সাইক্‌স্ চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করে' বলে' উঠ্‌ল—এই ছোঁড়া, ফিরে আয়। শীগ্‌গীর ফিরে আয়।

সাইক্‌সের তাড়ায় আর ঐ নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একটা চীৎকারের শব্দে চম্‌কে উঠ্‌তেই অলিভারের হাত থেকে আলোটা পড়ে গেল। সে কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না যে, সে এগুবে না পেছুবে।

তারপর আবার আওয়াজ হল—ওপরে একটা আলো বেরো

অলিভার পরিষ্কার দেখতে পেলে যে সিঁড়ির ওপরে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে—ভয়ানক চীৎকার উঠল—আর তারপরেই গুলির আওয়াজ—এবং সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে সে টলে পড়ে গেল।

চেঁচামেচি শুনে সাইক্‌স্ প্রথমটা পালিয়ে ছিল বটে কিন্তু তখনি সে ফিরে এল। লোকগুলোর দিকে সেও তার গুলি ছুঁড়তে লাগল, এবং ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য থেকে সে অলিভারকে তুলে নিয়ে ছুট দিলে। অলিভারের তখন সারা দেহ দিয়ে রক্তের স্রোত বইছিল, তার গায়ে গুলি লেগেছে।

গোলমাল ক্রমশঃ বাড়ছে—অনেক লোকের চেঁচামেচি—একটা ভয়ার্ত্ত বিভীষিকা। অলিভার খানিকটা এ সমস্ত টের পেলে, তার পরে সে যেন আর কিছুই শুনতে পেলে না।

—চৌদ্দ—

অলিভারকে নিয়ে পালাতে পালাতে সাইক্‌স্ তার পেছনের গোলমালকারীদের উদ্দেশে দাঁত খিঁচিয়ে বললে—তোদের গলা-গুলোকে নেক্‌ড়েয় ছিঁড়ে ফেলুক্ হতভাগারা! চেঁচাবার আর যায়গা পাও না! তারপরে ঐ কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারে ছেলেটার বোঝা বয়ে ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে খানিক দূর গিয়ে টবিকে উদ্দেশ করে জানালে—জোর জোর পা চালিয়ে ছুটেছ ত ফাঁকীবাজ, এদিকে এটাকে ধরতে হ'বে না, আমি একলাই বইব? ভাল বিপদে পড়া গেছে যা হোক!

ওর ঐ মধুবর্ষণ শুনে টবি ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল, কেন না, ওর পিস্তলের সীমানার ভেতরেই তখন সে রয়েছে।

—এসে ধরো না রাস্কেল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

টবি আস্তে আস্তে ফিরতে লাগল। সাইক্‌স্ আবার চেঁচিয়ে উঠল—শীগ্‌গীর।

এই সময় তাদের অনুসরণকারীর দল প্রায় তাদের কাছে এসে পড়েছে। ওদের কুকুরগুলো আর কয়েক গজ মাত্র দূরে! টবি তখন বলে উঠল—ছোঁড়াটাকে ফেলে রেখে সরে পড় সাইক্‌স্, ওরা এল বলে। বলবামাত্রই সে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে ছুট দিলে। সে বোধ হয় ভেবেছিল যে শত্রুরা যখন ধরে ফেলবেই তখন এক্ষেত্রে সাইক্‌সের আদেশ অমান্য করাই শ্রেয়স্কর।

সাইকস্‌ও ব্যাপারটা কিছু হৃদয়ঙ্গম করেছিল। তাই সে একটুখানি ভেবে অলিভারের জ্ঞানশূন্য দেহটাকে একটা ঝোপের আড়ালে গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে পিট্টান দিলে। ঠিক তারপরেই তিনজন পশ্চাৎধাবনকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে সব চেয়ে মোটা লোকটা বললে—চল এবার ফিরে যাই।

তাদের মধ্যে বেঁটে লোকটা জানালে—মিষ্টার গাইলস্ যা বলছে সে-ই ভাল।

মিষ্টার গাইলস্ তখন বাহাত্বরী দেখিয়ে বললে—তুমি ভয় পেয়েছ ব্রিট্‌ল্?

—না। আমি মোটেই ভয় পাইনি। আসলে যদিও ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল।

—তুমি নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছ।

—তোমার ধারণা ঠিক নয়।

—আমার ধারণা ঠিক, তুমিই মিথ্যে কথা বলছ।

হুজনে যখন এই রকম ঝগড়া লেগেছে, তৃতীয় ব্যক্তি তখন বিজ্ঞ দার্শনিকের মত ব্যাপারটাকে মিটিয়ে দেবার জন্যে বললে—তাহলে সত্যি কথা বলতে কি আমরা সকলেই ভয় পেয়েছি। তখন সকলেই স্বীকার করলে যে এই দারুণ অবস্থায় ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মিষ্টার গাইলস্ তখন আবার বলে উঠল—আমার রক্ত এত গরম হ'য়ে গিয়েছিলো যে আমি নিশ্চয়ই তাদের একটাকে খুন করতুম। শুধু ঐ ফটকের কাছে এসেই ত সব খিঁচ্‌ড়ে গেল।

আর দু'জন তাকে সমর্থন করতে করতে চল্‌ল, কিন্তু সবাই একেবারে জড়াজড়ি করে, কেন না, তাদের ভয় তখনো কাটেনি। কি জানি, যদি ডাকাতরা আবার পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে এই আশঙ্কাই তখন বেশী।

ক্রমশঃ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল, আকাশ ফসা হয়ে আসছে। চারিদিকের অন্ধকার যেন ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে, এক পশ্‌লা বৃষ্টিও নাম্‌ল। অলিভার কিন্তু এ সমস্ত কিছুই টের পাচ্ছে না, তার অচৈতন্য দেহ নির্জ্জীবের মত সেই জায়গায় পড়ে আছে।

খানিক পরে যন্ত্রণা-কাতর একটা অস্ফুট শব্দ করে সে জেগে উঠল। তার বাঁ হাতে গুলি লেগেছিল, তখনো সেখান থেকে রক্ত ঝর্‌ছে। জামাটা রক্তে যেন একেবারে লাল হয়ে উঠেছিল। তার শরীর ভয়ানক দুর্ব্বল, অতি কষ্টে উঠে বসে সে সাহায্যের জন্য একবার চারিদিকে তাকাল। খাড়া হয়ে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলে না, ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

তখন তার সম্পুর্ণ জ্ঞান ছিল, খানিকটা শুয়ে থেকে সে ভাবলে যে এই অবস্থায় পড়ে থাকলে কিছুতেই সে বাঁচবে না। এই আশঙ্কা মনের মধ্যে উদিত হওয়া মাত্র সে যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তাই নিয়ে উঠে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে এগুতে লাগল। অর্দ্ধ-আচ্ছন্নের মত টল্‌তে টল্‌তে সে একটা বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। মনে মনে ভাবলে হয়ত এর অধিবাসীরা তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে পারে, আর যদিও তা না করে তবুও রাস্তায় মরার

চেয়ে এই বাড়ীর দোর গোড়ায় মরা শতগুণে ভাল। এই ভেবে সে তার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে সেই বাড়ীর দিকে এগুতে লাগল।

খানিকটা গিয়েই তার স্মরণ হ'ল এ বাড়ী যেন সে পূর্ব্বে দেখেছে। কিন্তু সঠিক কিছু সে মনে করতে পারলে না। তারপর পাঁচীলের কাছে এসে তার পরিষ্কার মনে পড়ল যে গত রাত্রে এরই ভেতর সে দুজন বদমাইসের সঙ্গে চুরি করতে ঢুকেছিল। ব্যাপারটা স্মরণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অলিভারের এত ভয় হ'ল যে আশঙ্কার চোটে মুহূর্ত্তের জন্য যেন সে তার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গেল এবং একবার ভাবলে যে সে দৌড়ে পালায়; তারপর ভাবলে যে কোথায় সে পালাবে? তার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, এখনি হয়ত সে পড়ে যাবে! এই রকম ভেবেই সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বন্ধ দরজায় আঘাত করলে এবং প্রকৃতই তৎক্ষণাৎ সেই জায়গায় লুটিয়ে পড়ল।

সেই সময় রান্নাঘরের ভেতর মিষ্টার গাইলস্ তার অভ্যাস বশতঃ চাকর-বাকরদের কাছে নানা রকম বাহাদুরি মেরে পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনাটা বর্ণনা করছিল।

এমন সময় অলিভার এসে দরজায় ধাক্কা দিলে। ভয়ে কারও মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। গাইলস্ উঠে দাঁড়িয়েছিল ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললে—কে ধাক্কা দিচ্ছে, একজন গিয়ে খুলে দাও না।

কে খুলে দেয়! সকলেরই প্রাণ তখন ভয়ে একেবারে উড়ে গেছে।

গাইল্স্ তবুও বললে—আশ্চর্য্য ত! এ সময় কে আবার এল?

যাই হোক্ তোমরা কেউ গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে এস। বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ব্রিট্‌লের পানে তাকালে। কিন্তু তাকালে কি হ'বে, ব্রিট্‌ল্ স্বভাবতঃই নিরীহ, সুতরাং সে নিজেকে গাইল্‌সের 'কেউ-র' মধ্যে গণ্য করলে না! গাইল্‌স্ তখন আর একজনের দিকে তাকালে, ব্যাপার বুঝে সে তখন হঠাৎ ঘুমোবার ভাণ ধরেছে। আর স্ত্রীলোকদের ত আদেশ করা চলে না।

গাইলস্ তখন ব'লে উঠল—ব্রিট্‌ল্ যদি দরজা খুলে দিতে এগোয়, আমি তার সঙ্গে যেতে রাজী আছি।

আর একজন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে হঠাৎ জেগে উঠে বল্‌লে —আমিও।

ব্রিটল্ তখন নিরুপায় হ'য়ে অগ্রসর হ'ল। প্রথমে সবাই খড়খড়ি তুলে ভাল করে' দেখে নিলে যে, হ্যাঁ এটা পরিষ্কার দিন—রাত্রি নয়! তারপর গাইলসের পরামর্শ মত তারা সবাই খুব কলরব করতে লাগল, এর উদ্দেশ্য হ'ল শত্রুপক্ষকে (যদি কেউ থাকে) জানানো যে তারা দলে খুব ভারী। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গাইলস্ মুহুর্মুহু কুকুরগুলোর লেজ মুলতে লাগল, তারাও অবিশ্রান্ত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ জুড়ে দিলে। এই রকম ভাবে প্রস্তুত হ'য়ে গাইলস্ সকলকে আঁকড়ে ধরলে, তার উদ্দেশ্য যে কেউ যেন না পালাতে পারে। তারপর সে দরজা খোলবার আদেশ দিলে। ব্রিট্‌ল্ তখন দরজা খুললে। সকলেই চঞ্চল হ'য়ে ঠেলাঠেলি করে মুখ বাড়িয়ে দেখলে যে বাইরে তাদের পরিকল্পিত শত্রুপক্ষ কেউ-ই নেই, শুধু অলিভার সেই রকম আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে।

গাইলস্ আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে উঠল—ওহো! একটা ছোঁড়া যে! কি ব্যাপার? ব্রিট্‌ল্ দেখ ত। চিনতে পার কি না?

ব্রিটল্ দরজা খুলেই পেছনে সরে পড়েছিল। এবার সামনে এসে অলিভারকে দেখেই একটা বিকট চীৎকার করে উঠল।

গাইলস্ তখন অলিভারকে হেঁচ্‌ড়াতে হেঁচ্‌ড়াতে টেনে এনে ঘরের মধ্যে ফেলে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে বললে—এই ব্যাটা—এই ব্যাটা সেই ডাকাতদের একজন। গিন্নীমা, নেমে আস্থন, ধরেছি এক বেটাকে। বেটার হাতে গুলি লেগেছে, আমিই বেটাকে গুলি করেছিলুম। আমি—আমি।

দু'জন পরিচারিকা তখনই উর্দ্ধশ্বাসে ওপরে খবর দেবার জন্য ছুটল যে একজন ডাকাত ধরা পড়েছে এবং আর একজন চাকর অলিভারকে শুশ্রূষা করতে লাগল যাতে সে ফাঁসী হবার আগে না মরে যায়!

ঐ রকম হট্টগোলের মধ্যে ওপরের সিঁড়ির কাছ থেকে মধুর স্বরে বামাকণ্ঠে আওয়াজ এল—গাইলস্?

—এই যে দিদিমণি, তোমার কিছু ভয় নেই। বেটাকে কাবু করেছি।

—আচ্ছা আচ্ছা, তোমায় বাহাদুরী করতে হ'বে না। ওর কি ভয়ানক লেগেছে?

—হ্যাঁ দিদিমণি।

—বেশ। তাহ'লে তোমরা এখন সোরগোল না করে, ওকে ওপরে এনে শুইয়ে দাও, আর একজন গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

—কিন্তু তুমি কি ওকে একবার দেখবে না? প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে গাইলস্ এমন ভাব দেখালে যেন অলিভার হচ্ছে একটা চিড়িয়াখানার দ্রষ্টব্য জীব।

—না না, এখন নয়। তোমরা ওকে ভাল করে শুশ্রূষা কর—আমার অনুরোধ।

নিরুপায় গাইলস্ তখন নিরাশ হ'য়ে অগত্যা অলিভারকে উপরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে।

উপরে যে ঘরে অলিভারকে শোয়ানো হ'ল, ঠিক তার পাশের ঘরেই দু'জন মহিলা বসে। একজন প্রৌঢ়া, তাঁর বয়স হয়েছে, আর একজন তরুণী, বয়স তখনও তার সতেরো পেরোয় নি।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে কাল রাত্রির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলেন, হঠাৎ তরুণীটি বলে উঠল—ডাক্তার ডাকতে অনেকক্ষণ ত লোক গেছে! একঘণ্টা হয়ে গেল না?

গাইলস্ তাড়াতাড়ি জবাব দিলে—হ্যাঁ দিদিমণি, একঘণ্টা বার মিনিট হ'য়ে গেছে।

—যাকে পাঠানো হ'য়েছে সে ত সব সময়ই নিড়্বিড়ে।

—তা' যা বলেছ দিদিমণি, ও একটুও চট্পটে নয়।

এমন সময় একজন মোটা মতন ভদ্রলোক ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বল্লেন—উঃ, কী ভীষণ ব্যাপার! আমি এ রকম কখ্খনো শুনিনি। বলেই তিনি প্রৌঢ়ার ও তরুণীটির করমর্দ্দন করে ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ে জানালেন—তোমরা বেঁচে আছ! এঁ্যা। তোমাদের ত ভয়ে একেবারে মরে যাবার কথা কেন

তোমরা তখ্খুনি আমার কাছে লোক পাঠালে না? এ লুকিয়ে
মধ্যে আমার সব লোকজন এসে পড়ত। উঃ, কী ভয়
ওঃ, তাও আবার রাত্তির বেলা, একেবারে অপ্রত্যাশিত র মত

মোটা ভদ্রলোকটি হচ্ছেন ডাক্তার। তাঁর রাত্রিতে
শুনেই মাথা ঘুলিয়ে গেছলো, কেন না, তিনি জানতে বিশ্বাস
ডাকাতি ত দিনেই হয়।

তারপর তিনি তরুণীটীর দিকে চেয়ে বললেন—মি াশের
আমি ত—

তরুণীটী উত্তর করলে—সে পরে হবে'খন ডাক্তারবাবু, এ
ওপরে যে বেচারী শুষ্‌ছে!

—ঠিক মা, চল ত তাকে দেখিগে।

ডাক্তারবাবু তখন একা অলিভারকে দেখতে চলে গেলেন এবং অনেকক্ষণ কেটে গেল তবুও তিনি আসেন না দেখে প্রৌঢ়া এবং তরুণী ভাবলে যে, বুঝিবা চোরটার সাংঘাতিক চোট লেগেছে। তাঁদের এ ধারণার আরও কারণ ছিল, কেন না, ডাক্তারবাবুর আদেশে চাকরগুলো ওপর নিচে করে একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে তিনি আসতে প্রৌঢ়া তাঁকে জিগেস করলেন—ভয়ানক লেগেছে কি ডাক্তারবাবু?

—খুব যে লেগেছে তা নয়। আপনি কি এখনো চোরটাকে দেখেন নি?

—না।

—তার সম্পর্কে কিছু শোনেনও নি?

—কিন্তু রোজ্ দেখতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু আমি দেখতে
সঙ্গে সঙ্গে গ
চিড়িয়াখাননা, তাকে মোটেই বিকটাকৃতি কিছু দেখতে নয়। আমার

—না ‹পনাদের দেখতে কি কিছু আপত্তি আছে?

আমার অ:, তাতে আর কি আপত্তি থাকতে পারে?

নিরুপবে াস্থন, কোন ভয় নেই।

উপরে ি রকম ভাবে তাদের আশ্বস্ত করে ডাক্তারবাবু সকলকে

উপ' দরজার গোড়ায় নিয়ে গিয়ে বললেন—দাঁড়ান, দেখে ঘরেঁসি সে কী রকম আছে। তারপরেই ঘর ঢুকে তিনি সকলকে অভ্যন্তরে আসতে ইঙ্গিত করলেন, এবং সকলে অত্যন্ত হতাশ হয়ে দেখলো যে ভীষণাকৃতি দস্যুর পরিবর্তে বিছানায় একটা অল্প-বয়স্ক ছেলে শুয়ে আছে। ডাক্তারবাবু তখন তাকে পরীক্ষা কর-ছিলেন। তরুণীটি আস্তে আস্তে গিয়ে তার বিছানার পাশে বসে অলিভারের মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগল। তার চক্ষু তখন সজল হয়ে এসেছিল, এক ফোঁটা অশ্রু টপ্ করে অলিভারের কপালের ওপর পড়ল।

এই সামান্য পরশে ঘুমন্ত অলিভার যেন একটু হেসে উঠল। মনে হ'ল সে যেন তার এত দিনের অনুভূতির বাইরে কোন ভাল-বাসার স্বপ্ন দেখছে।

প্রৌঢ়া আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলেন—ওমা, এ! এ কখনই ডাকাত দলের ছেলে হ'তে পারে না।

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন—পাপ সর্ব্বত্রই বিচরণ করে। কে

...তে পারে যে বাইরের সৌন্দর্য্য ভেতরের কুৎসিতকে লুকিয়ে নি।

—কিন্তু এ কি বিশ্বাস করা যায় ডাক্তারবাবু, যে এর মত কজন ছোট্ট ছেলে স্বেচ্ছায় ডাকাতদের সংস্পর্শে এসেছে ?

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে জানালেন যে সময়ে সময়ে বিশ্বাস রতে হয় এবং রোগীর বিশ্রামের ক্ষতি হবে ভেবে সকলকে পাশের রে নিয়ে এলেন।

রোজ্ তবু বলতে লাগল—তাও যদি সত্যি হয়,তাহলেও ভেবে খুন হয়ত ও কখনো মার স্নেহ পায় নি, পায় নি কারও আশ্রয়। ই নানান্ বিপর্য্যয়ে না খেতে পেয়ে সে পাপের পথে অগ্রসর হয়েছে। ড়িমা, তোমার পায়ে পড়ি খুড়িমা, তুমি ওকে জেলে দিও না।

প্রৌঢ়া তখন তাকে কোলের কাছটিতে টেনে নিয়ে আদর করে লেন—দূর পাগলী, তোর কোন ভয় নেই, ওকে কিচ্ছু বলব না।

তাঁরা তখন তুজনে ডাক্তারবাবুকে জিগেস করলেন—ডাক্তার- কী করা যায় বলুন ত ?

—আমায় ভাবতে দিন। এই বলে ডাক্তারবাবু তু'পকেটে হাত গুঁজে পায়চারী করতে লাগলেন। তারপরে নানান্ ম অঙ্গভঙ্গী করে নিজের মনের মধ্যে কি কতকগুলো ড়বিড়্ করে আওড়ে অবশেষে তিনি বলে উঠলেন—চাকর- করদের ধমক্-ধামক্ দিয়ে অন্য রকম ভাবে ব্যাপারটা দাঁড় তে হ'বে, তবেই একে বাঁচানো যাবে। এতে রাজী আছেন ত ?

—অন্য উপায় না থাকলে তাই করতে হ'বে।

—না, অন্য আর কোন বাঁচাবার উপায় নেই। ও সম্ভবত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জেগে উঠবে। তখনি যদি ওর সঙ্গে কথাবা কয়ে বুঝতে পারি যে সত্যিই ও অনিচ্ছায় ডাকাতের দলে গি পড়েছে তবেই ওকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হবে

—হ্যাঁ তাই।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কিন্তু অলিভারের ঘুম ভাঙল না, কয়ে ঘণ্টা কেটে গেল। অবশেষে ডাক্তারবাবু জানালেন যে ছেলে জেগে উঠেছে এবং এখন তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া চলবে তখন সকলে গিয়ে অলিভারের কাছ থেকে সমস্ত কাহিনী শুনলে যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে অলিভারের গলা আড়ষ্ট হয়ে আসছি তবুও সকলে শুনে যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। সেবা ও শুশ্রূষায় সেই রাত্রিটা অলিভারের বেশ আরামে কাটল, এ মরতেও বোধ হয় তার আপত্তি ছিল না।

অলিভারকে বিশ্রাম উপভোগ করতে দিয়ে সকলে বেরি এলেন। ডাক্তারবাবু তখন চাকরদের গড়বার-পেটবার ভার নি নীচে এলেন এবং দালানে কাকেও দেখতে না পেয়ে সোজা রান্না ঘ গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন গাইলস্, ব্রিট্‌ল্ ও আর স জম্‌কালো রকমের মজ্‌লিস বসেছিল। পূর্ব্ব রাত্রির কথাই ত আলোচনা হচ্ছে। ডাক্তারবাবুকে ঢুকতে দেখেই গাইলস্ আ হয়ে জিগেস করলে—রুগী কেমন আছে ডাক্তারবাবু?

—এক রকম আছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে তুমি নিজে একটা জালে জড়িয়ে ফেলেছ।

গাইলস্ তখন ভয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে বললে—তবে কি ও
ারা যাবে? এমন জানলে আমি ওকে তখন আঘাত করতাম না।

—না না,সে কথা নয়। আচ্ছা তোমরা ত' নিজেদের ধর্ম্ম মানো?

—আজ্ঞে মানি বৈকি ডাক্তারবাবু।

—তাহলে তোমরা ঠিক শপথ করে বল দেখি ঐ ছেলেটাকেই
কে কাল রাত্রিতে তোমরা জানলা দিয়ে ঢুকতে দেখেছিলে? সত্যি
কথা বলো।

ডাক্তারবাবু স্বভাবতঃই নিরীহ প্রকৃতির লোক, কিন্তু তাঁকে
কথাগুলো এমন গম্ভীর ও রাগান্বিত ভাবে জিগেস করতে শোনা
গেল যে গাইলস্ ও ব্রিট্‌ল্ দুজনে বোকার মত দুজনের মুখ চাওয়া-
চায়ি করতে লাগল।

ডাক্তারবাবু আবার তর্জ্জন করে জিগেস করলেন—সত্যি কথা
বলো, তোমরা ঐ ছেলেটাকেই ঢুকতে দেখেছিলে?

কেউই জবাব দিতে পারলে না, সবাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে
চেয়ে রইল।

এমন সময় বাইরে গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ শোনা গেল। ব্রিট্‌ল্
বলে উঠল—পুলিশ এসেছে বোধ হয়।

ডাক্তারবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বলে উঠলেন—কে?

—পুলিশ, ডাক্তারবাবু। আমি আর গাইলস্ তাদের খবর
দিয়েছিলাম। তাদের আরও আগে আসা উচিত ছিল।

ডাক্তারবাবু আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন।

—পনেরো—

পুলিশের দারোগা ও তাঁর সহকারীটি ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর হাতকড়াটা রেখে বললেন—ব্যাপার কি? কী হ'য়েছে বলুন ত।

ডাক্তারবাবুর ইচ্ছে ছিল যে অলিভারকে বাঁচানোর জন্যে ব্যাপারটাকে কোন রকমে ধামা চাপা দেওয়া। তার চেষ্টাও তিনি করছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিট্‌ল্ ও গাইল্‌সের অতি-বুদ্ধির দোষে পুলিশ এসে পড়ায় তাতে বাধা পড়ল। তবুও তিনি যথাসম্ভব কৌশলের সঙ্গে ঘটনাটাকে বিবৃত করলেন।

দারোগা সাহেব বল্‌লেন—যে ছেলেটা আহত হয়েছে, তার সম্বন্ধে যে চাকররা অন্য রকম বল্‌ছে।

—তারা ভুল করেছে। তাদের মধ্যে একজনের ভয়েতে মনে হ'য়েছিল বুঝি ঐ ছেলেটিই গত রাত্রে ঢুকেছিল। তা' অসম্ভব।

—কিন্তু তাহলে ছোঁড়াটাই বা কোত্থেকে এল? সে ত আর আকাশ থেকে পড়ে নি?

—নিশ্চয়ই নয়। তার কথা পরে জানাবো। প্রথমে আপনারা চুরির জায়গাটা দেখ্‌বেন না?

দারোগাসাহেব তখন দলবল নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করতে গেলেন। এদিকে ডাক্তারবাবু এসে গৃহকর্ত্রীকে জানালেন—কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না।

রোজ্ বলে উঠল—ছেলেটির ইতিহাস সমস্ত বললে ওরা নিশ্চয়ই ওকে ছেড়ে দেবে।

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন—বোধ হয় না। সব শুনলে ওরা হয়ত ওকে নিয়ে আরও বেশী টানাটানি করবে!

রোজ্ তখন ব্যাকুলভাবে শুধোলে—তাহলে কি হবে ডাক্তার বাবু? কেন ওরা শুধু শুধু পুলিশ ডাকতে গেল!

এতক্ষণে দারোগাসাহেব সমস্ত তদন্ত শেষ করে মন্তব্য করলেন—গড়াপেটা ডাকাতি। ঐ চাকরদের মধ্যে কেউ এর মধ্যে আছে।

গৃহকর্ত্রী জানালেন—না না, তাদের কাউকেই সন্দেহ হয় না।

তারপরে তাদের পানীয় দিয়ে পরিতুষ্ট করার পর ডাক্তারবাবু তাঁদের ওপরে অলিভারের ঘরে নিয়ে গেলেন। অলিভার তখন জ্বরাচ্ছন্ন। ডাক্তারবাবু তাকে মিনিটখানেকের জন্যে আধশোয়া অবস্থায় বিছানায় তুলে বললেন—এই ছেলেটিই দৈব-দুর্ঘটনায় বন্দুকের গুলিতে আহত হ'য়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

দারোগাসাহেব ও তাঁর সহকারী তখন জিজ্ঞাসুনেত্রে গাইল্‌সের পানে তাকালেন। সে তখন কেমন যেন ভেবড়ে গেছল, তাই আমতা আমতা করে বললে—আমার যেন মনে হচ্ছে যে ঐ ছেলেটাই—

—যেন মনে হলে চলবে না, ঠিক করে বলো।

—ঠিক কিছু বলতে পারছি না। তবে—

—তবে কি?

গাইলস্ এবার যেন আরও ভেবড়ে গেল। বললে—না কিছু নয়। আমার যেন মনে হচ্ছে এ ছেলেই নয়। আমি আর কিছু—

তার কথা শুনে দারোগা সাহেব হেসে উঠে জিগেস করলেন—লোকটা কিছু নেশা-টেশা করেছে নাকি ?

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ অলিভারের নাড়ী পরীক্ষা করছিলেন, এবার বললেন—আপনারা না হয় ব্রিট্‌ল্‌কে জিগেস করুন।

ব্রিট্‌ল্‌কে প্রশ্ন করা হ'লে সে আরও হাস্যাস্পদভাবে সমস্ত ব্যাপারটা বিবৃত করে বললে যে সে কিছুই জানে না, গাইল্‌স্‌ই তাকে ঐ সমস্ত বলেছে।

যাই হোক্, এতেই ব্যাপারটা প্রমাণাভাবে মিটে গেল, এবং দারোগাবাবু আরও এক অদ্ভূত রিপোর্ট দাখিল করবার মানসে সদলবলে প্রস্থান করলেন।

অলিভার কিন্তু সেরে উঠতে সময় নিলে। তার হাতের আঘাত উপশম হলেও ঠাণ্ডা লাগার দরুণ জ্বরে সে অনেক দিন ভুগ্‌ল এবং তারপর ক্রমশঃ সে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হ'ল। একথা ঠিকই যে অসুখের সময় সে যদি ঐ রকম স্নেহের সেবাযত্ন না পেত তাহলে সে কিছুতেই বাঁচত না। তাই একটু ভাল হ'য়ে যেদিন সে ওদের প্রতি একান্ত ধন্যবাদের ভাষা প্রয়োগ করতে গেল, রোজ্ বললে—আচ্ছা হয়েছে, তুমি ইচ্ছা করলে পরে আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানাতে পারবে। আমরা শীগ্‌গীর দেশে যাব, খুড়ীমা বলছেন তোমায়ও সঙ্গে যেতে হবে। সেখানে তুমি আরও তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে।

এই অযাচিত স্নেহের প্রয়োগে অলিভার আরও কৃতজ্ঞ হ'য়ে বলে উঠল—আমি যদি আপনাদের কোন কাজে আসতে পারি ত আমাকে আপনারা কাজ করতে দেবেন। আমি আপনাদের বাগানের গাছে জল দেব, ফাইফরমাজ্ খাটব।

—না গো না, তোমায় সে-সব ভাবতে হ'বে না। তুমি আমাদের আরও অনেক রকমে সুখী করতে পারবে।

—সুখী করতে পারব! কিন্তু আমি ভাবছি একজনের প্রতি আমি কী অকৃতজ্ঞতাই না প্রকাশ করেছি।

—কার প্রতি গো?

—সেই স্নেহশীল ভদ্রলোকের প্রতি যিনি আমায় পূর্ব্বে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

—তোমার ভাবনা কি, তুমি একেবারে সেরে উঠলে ডাক্তার-বাবু তাঁদের কাছে তোমায় নিয়ে যাবেন।

এই জবাব শুনে অলিভারের চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল।

কিছুদিন পরে অলিভার একেবারে সেরে উঠলে ডাক্তারবাবু সত্যিই তাকে নিয়ে একদিন মিষ্টার ব্রাউনলোর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁরা একখানি গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিলেন, গাড়ীখানা পোলের ধারে এলে অলিভার ভয়ে পাংশু মেরে বলে উঠল—ওই বাড়ীটা, ওখানেই ডাকাতরা আমায় নিয়ে গেছল। ডাক্তারবাবু রাগে ও ঘৃণায় সেই বাড়ীটার দিকে একবার ফিরে তাকালেন।

মিষ্টার ব্রাউনলোর বাড়ীর গলিটার নাম অলিভারের জানা ছিল, তাই তার নির্দ্দেশে গাড়ী যখন সেই গলিটার মধ্যে প্রবেশ

করলে তখন তার বুকটা আপনাথেকেই দুরদুর্ করতে লাগল ডাক্তারবাবু যখন জিগেস করলেন—কোন্ বাড়ীটা অলিভার তখন সে চীৎকার করে বললে—ওই যে, ওই সাদা বাড়ী। গাড় এসে সেই বাড়ীর দরজায় থামল। কিন্তু একি! সব বন্ধ,' শু একটা বোর্ড ঝুলছে—ভাড়া দেওয়া যাইবে। পাশের বাড়ী থেবে সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে ব্রাউনলো মশাইরা সব এখান থেবে চলে গেছেন।

তখন অগত্যা আর কি করা যাবে, তাঁরা ভয়ানক নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। এই নিরাশার বেদনা কিন্তু অলিভারকে ভয়ানং পীড়িত করেছিল।

এক পক্ষকাল পরে রোজেরা সকলে অলিভারকে নিয়ে দেশে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, এখানকার বাড়ীতে কেবল রইল গাইলস্ অন্য একজন চাকর। সেখানে পৌঁছে অলিভারের আনন্দ যে আর ধরে না। ঐ শ্যামল প্রান্তর আর শ্যাওলা-ভরা পাষা আবরণের মাঝখানে গ্রামখানিতে রুগ্ন বালকের জন্যে যেন এব মায়াময় পুলক লুকিয়ে আছে। সহরের ধূমাচ্ছন্ন জীবনে অভ্যস্ত অলিভারের নিকট এ যেন অত্যন্ত ভাল লাগল। সোনালী দিন সুন্দর রাত্রি, অপরিমেয় স্নেহধারা,—এরই মাঝখানে অলিভার ফ্যাগিন এখানে আর তেড়ে আসে না। সকালবেলা ে রোজেদের সাথে বেড়াতে বেরোয়, তারপর ফিরে এসে নিজে পড়াশোনা করে; খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর বেলা কত গল্প-গুজব। তারপরে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে

আবার সান্ধ্য-ভ্রমণ। রবিবারের দিনটা যেন আরও স্ফুর্ত্তিতে কাটে। সকালবেলা তারা গ্রাম্য গীর্জ্জায় প্রার্থনা করে আসে, এদিনটায় তাকে আর নিজের পড়ার বই পড়তে হয় না, শুধু রাত্রে ওদের সে খানিকটা বাইবেল পড়ে শোনায়।

এই রকম করেই তিনটে মাস কেটে গেল, অলিভারের জীবনে এই তিনটে মাস কত না মূল্যবান্!

এই তিন মাস পরে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল যাতে সকলকে শঙ্কিত করে তুললে। রোজ্ একদিন হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা বিমর্ষ হয়ে শুয়ে পড়ল। খুড়ীমা এসে জিগেস করলেন—কিরে রোজ্, অসুখ করেছে?

—না খুড়ীমা, কিছু ভাল লাগছে না।

তারপর দিনই রোজ জ্বরে একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হ'লে তিনি তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হ'লেন। কয়েকদিন এমন সঙ্কট অবস্থায় গেল যে সকলের মনে হ'ল বুঝি বা রোজ আর বাঁচবে না। সবার মুখের ওপরই যেন একটা বিষাদের রেখা, সারা বাড়ীখানার ওপর যেনমৃত্যুর যবনিকা! অবশেষে ডাক্তারবাবু জানালেন—আর ভাবনা নেই, বিপদ কেটে গেছে।

সবাই যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল, কিন্তু যতদিন না রোজ্ একেবারে সেরে উঠছে, ততদিন যেন কারও মুখে হাসি নেই। ডাক্তারবাবু অনেক কষ্টে সে যাত্রা ওকে বাঁচিয়ে তুললেন।

আবার আনন্দে দিন কাটে, আবার একসঙ্গে সকলে বেড়াতে

বেরোয়। রোজ্‌কে স্বাভাবিক ভাবে পেয়ে অলিভারের উৎসাহ যেন পুনরায় ফিরে এসেছে, সে অবার গল্প জুড়ে দেয়। শান্তির সুষমা যেন পুনরধিষ্ঠিত হ'ল।

এরই মাঝে হঠাৎ একরাত্রে অলিভার ঘুমের মাঝে ফ্যাগিনের স্বপ্ন দেখলে—দেখলে ফ্যাগিন তার সঙ্গীদের নিয়ে তাকে ধরতে তেড়ে আসছে। ভয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল, ছোট্ট তার ঘর, অন্ধকার। বাইরে চাঁদের আলো পড়েছে, কিন্তু সেধারে চেয়ে অলিভারের সমস্ত অঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গেল, কিয়ৎক্ষণ যেন সে কোন কথা বলতে পারলে না, ঐখানে জানলার ধারে ফ্যাগিন দাঁড়িয়ে, অলিভার ভেতরে তাই দেখে কাঁপছে। তারপর সে গোঁ গোঁ করে ভয়ানকভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

তার ঐ ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনে লোকজন সব দৌড়ে আসতেই সে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল—ঐ সেই ইহুদি! আমায় ধরতে আসছিল।

—কোথায় তাকে দেখলে?

—ঐ জানলার ধারে।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি করেও তারা কাকেও দেখতে না পেয়ে একটু আশ্চর্য্য হ'ল।

—ষোলো—

অলিভারকে জন্ম দিয়েই অলিভারের মা যখন মারা যান তখন তিনি তাঁর শুশ্রূষাকারিণীকে দুটো জিনিষ দিয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন অলিভার বড়ো হওয়া পর্য্যন্ত এগুলি যেন সে সযত্নে রেখে দেয়। সেই দুটি জিনিষের একটি হচ্ছে হীরের আংটী ও অপরটি হচ্ছে হীরের লকেট্।

বহু-বছর পরে সেই শুশ্রূষাকারিণীরও যখন মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এল তখন সে এই দু'টী জিনিষ যে স্ত্রীলোককে দিয়ে যায়, ঘটনা-ক্রমে তার সঙ্গেই আমাদের সেই স্মরণীয় বাম্বল্ মশাইয়ের বিবাহ হয়েছে। বাম্বল্ কিন্তু বিয়ে করে মোটেই সুখী হয় নি, স্ত্রী তাকে উঠতে-বসতে সব সময়েই খোঁটা দেয়, এবং এমন একটি দিনও যায় না যেদিন তাদের মধ্যে কলহ না ঘটে।

আজ বাম্বল্ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার পর মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। রাগের মাথায় এ রাস্তা সে রাস্তা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে যখন তার ক্ষিদে পেয়ে গেল, তখন সে খালি দেখে একটা সাধারণ পানাগারে গিয়ে ঢুকল। যে ঘরটায় সে প্রবেশ করলে, সেটাতে মাত্র একটি লোক বসেছিল, দেখে তাকে মনে হয় যে সে বিদেশী এবং অনেক দূর থেকেই এসেছে। এখন এটা স্বভাবতঃ হয়ে থাকে যে দু'জন সম্পূর্ণ অপরিচিত হ'লেই এ ওর দিকে পরস্পর গোপনে

গোপনে তাকায়। বাম্বলও তাই বিদেশীটীর পানে বারে বারে আড়চোখে দেখে নিচ্ছিল। এই রকম হচ্ছে টের পেয়ে বিদেশীটি শুধোলে—তুমি আমার দিকে অমন তাকাচ্ছ কেন?

—তাতে আপনার কোন ক্ষতি হয় নি নিশ্চয়।

—তা' হয় নি। তবে আমার মনে হচ্ছে যেন তোমায় আমি পূর্ব্বে কোথায় দেখেছি। তুমি আগে গীর্জ্জার কর্ম্মচারী ছিলে না?

—হ্যাঁ।

—এখন কি করছো?

—এখন আমি অনাথ আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক।

বিদেশীটি তখন আরও দু' গ্লাস পানীয় আনিয়ে, একটি বাম্বলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—তোমার খোঁজেই আজ আমি এখানে এসেছি। ঘটনাচক্রে তোমার সঙ্গেই দেখা হ'য়ে গেল। তোমার কাছ থেকে আমি গোটা কতক সংবাদ চাই, সত্য খবর। তার জন্যে এই নাও ধর। বলে সে কয়েকটা টাকা বাম্বলের হাতে গুঁজে দিলে।

বাম্বল্ সেগুলোকে বেশ করে বাজিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে জানালে—কি খবর শুনতে চান বলুন?

লোকটি তখন বললে—বারো বছর আগে তোমাদের ঐ অনাথ আশ্রমে একটি নারী একটি সন্তান প্রসব করেই মারা যায়। সে ছেলেটি ঐ অনাথ আশ্রমেই মানুষ হ'তে হ'তে হঠাৎ শিক্ষানবিস অবস্থায় পালিয়ে গেছিল।

—ওহো, অলিভারের কথা বলছেন? সে-বেটার মত পাজী বদমাস্—

—অলিভারের কথা আমি অনেক শুনেছি, সে নয়। তার মাকে মরবার সময় যে শুশ্রূষা করেছিল সে স্ত্রীলোকটি কোথায় ?

—সে গেল বছর মারা গেছে।

এ কথাটা শুনে লোকটি যেন কেমন আশ্চর্য্যভাবে তাকালে, তারপর উঠবার উপক্রম করলে।

এত সহজে লোকটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে বাম্বল্ একটু বিচলিত হ'ল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে তার অর্দ্ধাঙ্গিনীর কাছে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। তাই সে বলে উঠল —মশাই আর একজনের কাছে আপনার জিজ্ঞাস্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

—তাকে কোথায় পাব ?

—আমার সঙ্গে গেলেই পাবেন।

—কবে ?

—কাল।

তখন লোকটি পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে তাতে তার ঠিকানা লিখে বাম্বলের হাতে দিয়ে বললে—কাল রাত্রে তাহলে ন'টার সময় তাকে নিয়ে এই ঠিকানায় এসো। বলে সে লোকটা চলে গেল।

বাম্বল্ কাগজটার দিকে হতভম্বের মত খানিকটা তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল যে এতে ত' কোন নাম লেখা নেই, তাই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে লোকটির নিকট উপস্থিত হ'ল।

লোকটি তার পানে একবার ফিরে তাকিয়ে জিগেস করলে—আবার কি চাও ?

—একটা কথা, কি নামে আমি গিয়ে ডাকব ?

—মঙ্ক্স্। বলেই লোকটা পা চালিয়ে চলে গেল।

পরের দিন রাত্রে অনেক খুঁজে খুঁজে বাম্বল্ ও বাম্বল্-পত্নী সেই ঠিকানায় গিয়ে ডাকতেই ওপর থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল—কে ? ওঃ তোমরা এসেছ। আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। গলার আওয়াজ শুনেই বাম্বল্-পত্নী জিগেস করলে—ঐ লোকটাই নাকি ? বাম্বল্ হাঁ বলতেই সে জানালে—তাহলে যতটা পারা যায় ততটা কম বলবে।

লোকটি এসে দরজা খুলে দিতেই দুজনে গিয়ে ভেতরে ঢুকল। মঙ্ক্স্ তখন বাম্বল পত্নীর দিকে চেয়ে জিগেস করলে—এরই কথা কাল বলেছিলে না ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা তাহ'লে কাজের কথাই আরম্ভ করা যাক্। কি জান গা তুমি ?

বাম্বল্-পত্নী প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে জিগেস করলে—আমাদের এর জন্যে কত দেওয়া হ'বে ?

—এই কুড়ি পাউণ্ড।

—আরও পাঁচ পাউণ্ড বাড়িয়ে দিন।

মঙ্ক্স্ তখন পকেট থেকে পঁচিশ পাউণ্ড বার করে তার হাতে দিয়ে বললে—আচ্ছা, এবার তোমার খবরই শোনা যাক্।

বাম্বল্-পত্নী তখন আরম্ভ করলেন—স্ত্রীলোকটি যখন মারা যায় তখন আমি তার কাছে একলা ছিলাম। অলিভারের মা মৃত্যুর সময় যে জিনিসগুলো তাকে দিয়েছিল সেগুলো সে—

—কি করেছে, বিক্রী করেছে? কাকে? কোথায়?

—না, বাঁধা দিয়েছিল।

—সেগুলো এখন কোথায়?

—আমার কাছেই। বলে সে একটি ব্যাগের ভেতর থেকে সেই আংটী আর লকেট বার করে টেবিলের ওপর রাখলে। আংটির ওপর 'এ্যাগ্‌নিস্' কথাটি ক্ষোদিত ছিল।

মঙ্ক্‌স্ সেগুলোকে নিয়ে নিজের কাছে রাখতেই বাম্বল্-পত্নী শুধোলে—ওগুলো নিলেন কেন? ওগুলো কি আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হ'বে?

—না-না। মোটেই না। তবে দেখ। বলেই মঙ্ক্‌স্ একটা বোতাম টিপতেই মেঝের একখানা তক্তা ফাঁক হয়ে গেল, এবং সকলে সবিস্ময়ে দেখলে যে তলা দিয়ে জলস্রোত বয়ে যাওয়ার বিপুল শব্দ হচ্ছে। মঙ্ক্‌স্ জিগেস করলে—একটা মানুষকে এর মধ্যে ফেলে দিলে কোথায় গিয়ে সে পড়বে?

—বার মাইল দূরে নদীতে।

—বার মাইল দূরে, নয়? বলেই মঙ্ক্‌স্ সেই আংটী ও লকেটটা তার মধ্যে ফেলে দিলে।

তার এই কাণ্ড দেখে আর দু'জন মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল।

মঙ্ক্‌স্ তখন আবার বললে—আশাকরি একথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাবে না। এখন তোমরা যেতে পার।

বাম্বল্‌-দম্পতী তখন দু'বার হাত কচ্‌লে বেরিয়ে পড়ল।

এই মঙ্ক্‌স্ লোকটা হচ্ছে একটা পাজী বড় লোক। ফ্যাগিনের মত দুর্ব্বৃত্তদের নিয়ে সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। পরদিন মঙ্ক্‌স্ যখন একটা দুষ্কার্য্যের আলোচনার জন্য ফ্যাগিনের বাড়ী গিয়ে উঠল তখন নান্সী সেখানে ছিল, আড়াল থেকে সে তাদের আলোচনা সব শুনলে। শুনে যেন তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

রাত্রি তখন দশটা। সকলের অজ্ঞাতসারে নান্সী বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে খুব জোরে জোরে হেঁটেই সে হাইড পার্কের ধারে একটা সুদৃশ্য অট্টালিকার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। ভেতরে ঢুকতেই একজন পরিচারিকা জিগেস করলে—কাকে চাও ?

—মিস্ রোজ্ বলে কোন মহিলা এখানে থাকেন কি ? তাঁর সঙ্গে আমি একবার দেখা করব।

পরিচারিকাটী নান্সীর এই পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে হাঁকিয়ে দিয়ে বললে—দেখা হ'বে না, যাও।

নান্সীও নাছোড়বান্দা, সে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগল। অবশেষে একজন ভালমানুষ গোছের পরিচারিকা তাকে মিস্ রোজের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির হ'ল। তরুণীটি তাকে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিগেস করলে—তুমি আমায় খুঁজছ ?

নান্সী তখন কাতরভাবে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললে—আমায় আপনি বাঁচান!
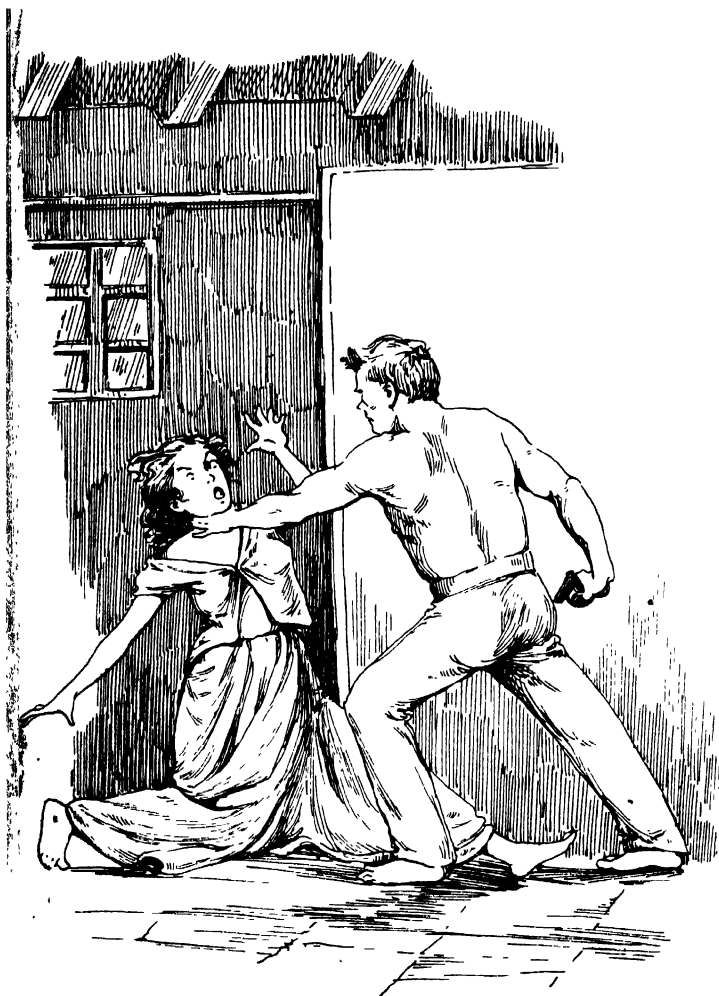
দুর্বৃত্তটা তাকে টেনে তুলে ঘরের মাঝখানে আছ্‌ড়ে ফেল্‌লে।

—পৃঃ

তরুণীটি ভাবলে হয়ত এ ভয়ানক গরীব, তাই সাহায্য চাইছে। সেই জন্যে সে বললে—ওঠ ওঠ, তোমার যদি কোন অভাব হ'য়ে থাকে আমি তা মেটাতে চেষ্টা করব।

নান্সী তবুও কাতরভাবে বললে—আমার কথা শুনলে আপনি হয়ত আমায় ঘৃণা করবেন।

তরুণীটি আশ্চর্য্যের সুরে জিগেস করলে—কেন?

আমিই অলিভারকে ভুলিয়ে ফ্যাগিনের হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

—তুমি!

—হ্যাঁ, আমি।

—উঃ কী ভয়ানক!

—কিন্তু যদি জানতেন যে আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়ে ক্ষুধার তাড়নায় মানুষে কী রকম হ'য়ে যায় তাহলে হয়ত—

—তোমায় দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে।

—আমার সঙ্গীরা যদি একবার টের পায় যে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম তাহলে তারা আমায় খুন করে ফেলবে। আমি ওদের যে পরামর্শ শুনে ফেলেছি তাই আপনাকে বলতে এসেছি, আচ্ছা আপনি মঙ্কস্ বলে কোন লোককে জানেন?

—কই না।

—সে কিন্তু আপনাকে জানে তার মুখে আপনার এই ঠিকানা পেয়েই আমি এসেছি। আপনাদের অলিভারকেই তার যেন বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল, তাই ফ্যাগিনকে মোটা টাকা দিয়ে সে অলিভারকে চুরি করায়।

—এতে তার কি লাভ ?

—তা' ঠিক জানি না। তবে কাল রাত্তিরে চুপিচুপি শুনলুম যে সে ফ্যাগিনকে বলছে—'ও ছোঁড়াটার আসল পরিচয়ের একমাত্র প্রমাণ আমি সমুদ্র-গর্ভে ফেলে দিয়েছি। ফ্যাগিন্, তুমি ওটাকে এবার জেলে পচিয়ে মারবার বন্দোবস্ত কর।'

তরুণীটি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিগেস করলে—এ সব সত্যি ?

—হ্যাঁ, আমি শপথ করে বলছি। সে আরও বলেছিল—ফ্যাগিন্, তুমি জাতে ইহুদি, আমার ছোট ভাই ঐ অলিভারকে সরিয়ে রাখার প্রস্তাব ত তোমার কাছে একটা মস্ত দাঁও।

—ওর ভাই !

—হ্যাঁ, এই রকমই ত সে বলেছিল।

—তাহলে তোমাকে ত আর ছাড়ছি না, আমি এক ভদ্রলোককে এখনি ডাকাচ্ছি, তুমি তাঁর কাছে সব বলবে।

—না না, আমায় ছেড়ে দিন, আমি চলে যাব। আমি তাদের সবার মৃত্যুর কারণ হ'তে পারব না।

—কেন ?

—আমি আপনাকে যা' বললাম, তা' যদি অপরকে বলি তাহ'লে ওরা নিশ্চয়ই সব ধরা পড়বে। আমি তা' পারব না।

—কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি কোন তদন্ত না হয় ত কি করে অলিভারকে রক্ষা করা যাবে ? যদি আমি অপরকে এ সংবাদ দিতে না পারি ত' এ খবর নিয়ে আমার কি হ'বে ?

—যে দয়ালু ভদ্রলোকটি অলিভারকে প্রথমে আশ্রয় দিয়ে

ছিলেন, তাঁর সাহায্যেই আপনি গোপনে সব ব্যবস্থা করুন—এইটুকু আমার মিনতি।

—আচ্ছা, আবার কবে তোমার দেখা পাব ?

—যদি আমি বেঁচে থাকি ত রবিবার রাত্রি এগারোটার সময় 'লণ্ডন-ব্রিজের' ওপর আমার সাক্ষাৎ পাবেন।

এই কথা বলেই নান্সী বিদায় নিলে।

মিস রোজের মানসিক অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। এমন একটা খবর সে শুনলে যার চেয়ে বিস্ময়ের আর কিছু নেই। নান্সীর কথাগুলো তার মনে যেন একেবারে গেঁথে গিয়েছে, কিন্তু কী করে সে সমস্ত রহস্যের উদ্ধার সাধন করতে পারে ? ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে হ'বে, অথচ এ সম্বন্ধে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে হয় ত' লোকের পরামর্শ আবশ্যক। এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে রোজের সে রাত্রি প্রায় বিনিদ্র কাটল।

পরের দিন সকালে আবার এ বিষয় নিয়ে সে চিন্তামগ্ন হয়ে উঠেছে, এমন সময় অলিভার এসে সেখানে হাজির হ'ল। তাকে খুব উৎফুল্ল দেখে সে জিগেস করলে—কি অলিভার, অত আনন্দ কিসের ?

—আমি সেই ভদ্রলোক—সেই ব্রাউনলো যাঁর নাম, যিনি আমায় একবার আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁকে দেখতে পেয়েছি।

—কোথায় রে ?

—একটা গাড়ী থেকে নেবে তিনি বাড়ীর ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি তাঁর কাছে কোন কথা বলিনি। কিন্তু জেনে

এসেছি এখন তিনি সেখানে থাকবেন। আমি এখনি তাঁর কাছে যাব।

রোজ তার কথা শুনে জবাব দিলে—আচ্ছা, শীগ্‌গীর একখানা গাড়ী আনতে বল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা মিষ্টার ব্রাউনলোর বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। অলিভারকে গাড়ীতে রেখেই রোজ মিষ্টার ব্রাউনলোর নিকট উপস্থিত হ'ল। তাঁর পার্শ্বে সে-সময়ও তাঁর সেই বন্ধু গ্রিম্‌উইগ্ বসে। রোজ্‌কে ঢুকতে দেখে ব্রাউনলো মশাই অভ্যর্থনা করে বললেন—এস, তোমার কি দরকার?

রোজ্ তখন তাঁকে বললে—আমি আপনার অপরিচিতা হলেও এখনি আপনাকে একটা খবর দিয়ে বিস্মিত করব। আপনি অলিভার টুইষ্ট্‌কে চেনেন নিশ্চয়ই!

ঐ নামটা উচ্চারিত হবামাত্রই তাঁর বন্ধুটি একেবারে সচকিত হয়ে উঠলেন। মিষ্টার ব্রাউনলোও অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, তাই বললেন—তার সম্বন্ধে এমন যদি কিছু জানো, যাতে তার প্রতি আমার যে মন্দ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা' বদলায়, তাহলে শীগ্‌গীর তা' বল।

বন্ধুটি বলে উঠলেন—সেই পাজীটার সম্বন্ধে ধারণা আবার বদলাবে!

রোজ্ শোনালে—অলিভার এক মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করেছে।

মিষ্টার ব্রাউনলো তখন জানালেন—ভগবানকে ধন্যবাদ যে

তুমি আজ আমায় একটা সত্যকার সুসংবাদ শোনালে। কিন্তু সে এখন কোথায় আছে ?

—নীচে গাড়ীতে।

কথাটা শোনবামাত্রই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। তারপর অলিভারকে ধরে এনে বললেন—আর একজনকে এ সম্পর্কে সংবাদ দিতে হ'বে। বলেই তিনি মিসেস্ বেড্উইনের নিকট খবর পাঠালেন।

মিসেস্ বেড্উইন্ অন্য সময়ের মতই ঘরে ঢুকে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। মিষ্টার ব্রাউনলো তখন তাঁকে ঠাট্টা করে বললেন—তুমি কি দিনকে দিন অন্ধ হচ্ছ ?

—আমার মত বয়সে ত তাই হওয়াই স্বাভাবিক।

আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু চশমা চোখে নিয়ে দেখ ত' নতুন কারুকে দেখতে পাও কিনা ?

তিনি চশমা পরবার আগেই কিন্তু অলিভার তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি তখন আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন—ওমা, এ যে অলিভার! আমি জানতাম ও একদিন ফিরে আসবে।

তাঁদের সেখানে রেখে রোজ আর ব্রাউনলো-মশাই পাশের ঘরে গিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি রোজের কাছ থেকে সমস্ত শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন। পরে ঠিক হ'ল যে ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি রোজেদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'বেন। ইতিমধ্যে রোজ্ তার খুড়িমাকে সমস্ত বিষয় আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলে রাখবে। তারপর তারা তাঁর কাছ থেকে [illegible] নিয়ে চলে এল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সকলে মিলে পরামর্শ বসল। ডাক্তার-বাবুও ছিলেন, তিনিও সমস্ত শুনে কম আশ্চর্য্য হ'ননি সকলেরই এক ভাবনা যে কী করা যাবে। অবশেষে ঠিক হ'ল যে নান্সীর কাছ থেকে রবিবারে মঙ্কসের বিষয় আরও সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা এ জিনিসটা অলিভারের কাছেও গোপন রাখবেন। তারপরে যা হয় ঠিক করা যাবে।

—সতেরো—

রবিবার এসে পড়ল। নান্সী রোজের কাছে কথা দিয়ে এসেছে যে রবিবার তার সঙ্গে দেখা হ'বে।

সেই রবিবারের রাত্রি, নিকটস্থ একটা গির্জ্জার ঘড়ি নির্দ্দিষ্ট সময় ঘোষণা করলে। সাইক্‌স্ আর বুড়ো ইহুদি ঘরের মধ্যে তাদের দরকারী কথাবার্ত্তা কইছে। নান্সী কিন্তু কিছুতেই স্থির হ'য়ে বসে থাকতে পারছে না, তার মন ছট্‌ফট্ করছে বাইরে যাবার জন্যে। সে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সাইক্‌স্ হেঁকে উঠল —কোথায় চলেছ?

—বেশী দূর নয়।

—তবু কোথায় শুনি?

—আমি ত বলেছি বেশী দূর নয়।

—দূর-টুর জানি না, কোথায় শুনতে চাই।

—তা' জানি না।

সাইক্‌স্ তখন রাগে চীৎকার করে উঠল—তবে যাওয়া চলবে না, বোস চুপ করে।

নান্সী জবাব দিলে—আমার শরীর ভাল নেই, বাইরে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

—বাইরে যেতে হ'বে না। ঐ জানলার ধারে হাওয়া আছে, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।

—ওখানে বেশী নেই, আমি বাইরেই যেতে চাই।

—তোমার যাওয়া চলবে না। বলেই সাইক্‌স্ ঘরের দরজায় চাবী লাগিয়ে নিজের কাছে সেটা রেখে দিলে।

নান্সী তখন প্রায় উন্মত্তের মত বলে উঠল—আমায় ছেড়ে দাও, আমি এখনি যেতে চাই। নইলে আমি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধিয়ে তুলব।

—না, হ'বে না।

নান্সী তখন বুড়ো ইহুদিকে সম্বোধন করে বললে—আমায় যেতে দিতে বল না ফ্যাগিন্!

ফ্যাগিন্ তার কোন জবাব দিলে না। নান্সী তখন দরজায় লাথি মেরে চীৎকার করে উঠল—আমায় যেতে দাও।

সাইক্‌স্ এবার তেড়ে এসে বললে—এ রকম যদি করিস্ ত তোকে কুকুর দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়াব।

নান্সী তবু চেঁচাতে লাগল—আমায় ছেড়ে দাও, বেশী নয় মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে।

তার এই উন্মত্ততা দেখে সাইক্‌স্ ফ্যাগিনকে শুধোলে—না, ঠাট্টা নয়, আজকে রাত্রিতেই ও বেরোবার জন্যে অমন করছে কেন বল ত?

—কিছু না, কিছু না, ও হ'ল গিয়ে মেয়েদের একগুঁয়েমি।

—কিন্তু আগে ত ও এরকম করত না, এখন নিশ্চয় বিগড়োতে আরম্ভ করেছে।

ফ্যাগিন্ কিছু না বলে শুধু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। তার-পর যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

সাইক্‌স্ কী ভেবে দরজা খুলে দিয়ে নান্সিকে বললে—ফ্যাগিন্‌কে নীচে আলো দেখিয়ে আয়। বাইরে গেলে কিন্তু মজা টের পাবি।

নান্সি ভয়ে ভয়ে ভাল মানুষের মত ফ্যাগিনের পেছনে পেছনে আলো দেখিয়ে চলল। সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে ফ্যাগিন্ নান্সিকে শুধোলে—এ সব কি হচ্ছে নান্সি?

—কি সব?

—এই যা হ'ল। তোমার যদি ওর কাছে থাকতে ভাল না লাগে তাহলে তুমি কেন—তারপর কী ভেবে কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বললে—আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন। তুমি আমায় বন্ধু বলেই জেনো। তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি আমার কাছে চলে আসতে পার।

—আমি তোমায় ভাল করেই চিনি। আচ্ছা আসি। এই বলে সে শুভরাত্রি জানিয়ে দরজা বন্ধ করে ওপরে উঠে গেল।

আর ফ্যাগিন্ ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে চলেছে। তার মাথায় তখন ঐ এক মতলব। নান্সিকে যদি সে একেবারে নিজের মত করে পায় ত তার দ্বারা অনেক সুবিধে হ'বে, যেহেতু সে খুব বুদ্ধিমতী। তার তাকে চাই-ই চাই। কিন্তু কি করে সাইক্‌সের চোখে ধূলো দেওয়া যায়, কী করেই বা যায় নান্সিকে রাজী করানো? 'আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি', এই ভাবতে ভাবতেই সে নিজের আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ফিরে এসে কিন্তু তার মাথায় এক আশ্চর্য্য মতলব খেলে গেল। তাইত, সাইক্‌স্ যে বলেছিল নান্সি আগে ত এ রকম ছিল না, এখন সে কেন এ রকম হ'ল ? রাত্রিতে বাইরে বেরুবার জন্যে তার আগ্রহই বা তবে কিসের ? মনে মনে সে ভাবলে যে এর একবার খোঁজ নিতে হ'বে, তাহ'লে হয়ত তার নান্সিকে পাওয়ার কিছু সুবিধে হ'তে পারে।

রাত্রি পৌণে বারোটার সময় নজরবন্দী সাইক্সের বাড়ীটা থেকে একটি নারীমূর্ত্তি বেরিয়ে হন্ হন্ করে লণ্ডন ব্রিজের দিকে ছুটল পেছনে কিছুদূরে নিঃসাড়ে আর একটি ছায়া তাকে অনুসরণ করছে, সে তা' টেরও পেলে না। অন্ধকার রজনী, নদীর ওপর যেন একটা গাঢ় কুয়াসার চাদর। তারই ভেতর দিয়ে নিকটবর্ত্তী দীপালোকগুলি অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় মাত্র, আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। লোকজনের চলাচলও তখন কমে এসেছে।

নারীমূর্ত্তিটি ব্রিজের মাঝখানে গিয়ে দু' একবার এধার ওধার চেয়ে থামল, বোধ হ'ল যেন সে কিছু খুঁজছে। তারই মিনিট দু'য়েক পরে সেখানে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল এবং তার ভেতর থেকে একটি তরুণী ও একজন বৃদ্ধ অবতরণ করলেন তাদের দেখবামাত্র ঐ নারীমূর্ত্তিটি সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে কোন রকম ভূমিকা না করে বললে—এখানে নয়, আর একটু নিরাপদ জায়গায় চলুন। নারীমূর্ত্তিটি নান্সি ছাড়া আর কেউ নয়।

সেই অনুসরণকারীও ছায়ার মত তাদের পেছনে পেছনে চলেছে। খানিকদূর গিয়ে সে এক জায়গায় তাদের কথাবার্ত্ত

শুনতে পেলে। নান্সি বলছে—আমার যেন বড্ড ভয় করছে, যেন মনে হচ্ছে একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবে।

—কিসের ভয়?

—তা' ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আশঙ্কা আমায় বিঁধছে। বুড়োটি বলে উঠলেন—ও কিছু নয়, মনের বিকার মাত্র। তুমি আর রবিবার আসনি, নয়?

—না, আমি আসতে পারিনি। আমায় জোর করে আটকে রেখে দিয়েছিল।

—কে?

—তার কথা ত' আমি আগেই ওঁকে বলেছি।

—তোমাকে কেউ সন্দেহ করেনি ত?

—না, কেউই সন্দেহ করেনি।

বুড়োটি তখন বললেন—ভালই হয়েছে। এর মুখে আমি তোমার সমস্ত কথা শুনলাম আমরা তোমায় বিশ্বাস করতে পারি ত?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাদের এক কাজ করতে হ'বে। ঐ মঙ্কসের কাছ থেকে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করা চাই। তা যদি না হয় ত ফ্যাগিন্‌কে ধরিয়ে দেওয়া হ'বে।

নান্সি এবার অস্ফুটে উচ্চারণ করলে—ফ্যাগিন্?

—হ্যাঁ, তুমিই তাকে ধরিয়ে দেবে।

—আমি তা' পারব না, কিছুতেই পারব না।

—কেন ?

—তাহ'লে ও ছাড়া আরও অনেকে ধরা পড়বে। আমরা সকলেই খারাপ জীবন যাপন করি।

—বেশ। তবে মঙ্ক্‌স্‌কে আমাদের হাতে ফেলে দাও। তার কাছ থেকেই অলিভারের জীবন বৃত্তান্ত সমস্ত জানা যাবে।

—কিন্তু যদি তা' না হয় ?

—তাহ'লে আমি কথা দিচ্ছি যে তোমার মত ছাড়া ফ্যাগিন্‌কে ধরিয়ে দেওয়া হ'বে না।

তখন নান্সি মঙ্কসের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললে যে সে দেখতে দীর্ঘকায় কিন্তু সবল নয়। তার চোখ মুখ ও চুল কৃষ্ণাভ, কথা বলবার সময় সামনের দাঁত বেরিয়ে থাকে, গলায় টাই বাঁধবার জায়গার ঠিক ওপরেই একটা দাগ—

—হ্যাঁ, চওড়া একটা ক্ষতের দাগ।

নান্সি আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলে—কি করে জানলেন ? আপনি কি তাকে দেখেছেন ?

তরুণীটিও আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, বুড়োটি জানালেন—তোমার বর্ণনা শুনে আমার যেন মনে হচ্ছে আমি দেখেছি। হয়ত সে-লোক নাও হ'তে পারে।

তারপর ঐ বুড়ো দু'চার বার এধার ওধার পায়চারী করলে, মনে মনে যেন আওড়ালে—এ নিশ্চয়ই সেই। কিন্তু মুখে সেভাব প্রকাশ না করে নান্সিকে বললে—তুমি আমাদের অনেক সাহায্য করেছ। তোমায় এর জন্যে কি দেব বল ?

—কিছুই নয়।

—না না, তাকি হয়? কিছু নাও।

—না। আমার কিছু নিয়ে আর কী হ'বে!

—কিসের জন্যে তুমি এ রকম বলছ? তোমার অতীতের পাপকে ধুয়ে মুছে তুমি পরিষ্কার করে ফেলে আবার ভাল জীবন যাপন কর।

—তা' কি আর পারা যাবে?

তরুণীটি বললে—কেন পারা যাবে না? তোমার জীবনের পরিণাম কি তুমি ভেবে দেখেছ?

—ভেবেছি। আপনার সামনের ঐ যে অন্ধকার আর ঐ সুতীক্ষ্ণ জলধারা, ওই আমার শেষ।

—না না, অমন কথা বোলো না।

—এ ছাড়া আর বাঁচবার কি উপায় আছে! আচ্ছা বিদায়! বলেই নান্সি চলিতে সুরু করলে।

তরুণীটি একটু হেঁকে বললে—কিন্তু তোমার টাকা নিয়ে যাও। আমি বলছি, আমার কথা রাখো।

—না। আমি টাকা চাই না, টাকার জন্যে আমি একাজ করিনি। আমায় এমন কিছু দিন, এমন কিছু যা' আমার কাছে অক্ষয় স্মৃতি হয়ে থাকবে। আপনাদের রুমাল কিংবা দস্তানা যা' আমি আপনাদের বলেই চিরকাল রেখে দিতে পারব। আচ্ছা, আজ আসি। বিদায়—বিদায়!

বলতে বলতেই নান্সি চলে গেল।

আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাগিনের অনুচর নিঃশব্দে মিলিয়ে গিয়ে একেবারে ফ্যাগিনের আস্তানায় এসে হাজির হ'ল।

ফ্যাগিন্ উৎকণ্ঠিত হয়েই বসেছিল। তার কাছ থেকে সমস্ত শুনে ওর চক্ষু কপালে উঠবার উপক্রম আর কি! চোখের সামনে ভেসে উঠছিল শুধু কারাগারের বিভীষিকা!

রাতটা কোন রকমে জেগে কাটিয়ে ভোর বেলা সে সেই অনুচরটাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটল সাইক্‌সের আস্তানায়। তাকে এক রকম জোর করে ডেকে তুলে বললে—সাইক্‌স্, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

কাঁচা ঘুমের ওপর এ রকম ব্যাপার সাইক্‌স্ প্রত্যাশা করেনি, তাই কিছু বুঝতে না পেরে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে হাঁ করে চেয়ে রইল।

ফ্যাগিন্ হন্তদন্ত হ'য়ে আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলে। সাইক্‌স্ সাগ্রহে জিগেস করলে—কী হয়েছে?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু, এবার সকলকেই জেলে পচতে হ'বে।

জেলের নাম শুনেই সাইক্সের রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে তড়াক করে উঠে পড়ে বললে—জেল! যে ব্যাটা পাঠাবে তাকে খুন করে ফেলব না, তা' সে যেই হোক্ না কেন। কোন্ বেটা পেছনে লেগেছে শুনি?

ফ্যাগিন্ এবার গম্ভীর ভাবে উত্তর করলে—নান্সি।

—নান্সি!

ফ্যাগিন্ তখন তাকে সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বিবৃত করলে বং সেই অনুচরটাকে দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ালে।

সাইক্‌সের চোখে যেন এবার আগুন জ্বলে উঠল। সে তখনি টল নান্সির ঘরের দিকে।

বেচারী মেয়েটী তখনো অসাড়ে ঘুমুচ্ছিল।

চীৎকার করে ও ডাকলে—এই ওঠ্।

ওর ডাকে মেয়েটা জেগে বললে—কে সাইক্‌স্? তারপর াপন মনে সে আবার আনন্দের সঙ্গে পাশ ফিরে শুতে গেল।

—ওঠ্ বল্‌ছি। তোকে আজ একেবারে চিরজনমের মত ঘুম াড়িয়ে দেব।

ওর রকম দেখে এবার নান্সি সত্যই ভয় পেলে। আশ্চর্য্য 'য়ে বললে—তুমি অমন করছ কেন সাইক্‌স্?

তার প্রশ্ন শেষ হ'তে না হতেই দুর্বৃত্তটা তাকে টেনে তুলে ঘরের াঝখানে আছড়ে ফেল্‌লে, তারপর তার মুখ চেপে ধরলে।

নান্সি কাকুতি মিনতি করতে লাগল কিন্তু ঐ নরপিশাচ সে-সব দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পকেট থেকে পিস্তল বার করে তার মাথার ওপর টিপে দিলে।

তারপর?—তারপর মাত্র একটা শব্দ, একটা ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ, ফিনকি দিয়ে রক্তস্রোত বইল। মেয়েটা টলতে টলতে পড়ে গেল, আর উঠল না।

—আটারো—

মঙ্কস্‌কে কৌশলে লোক দিয়ে মিষ্টার ব্রাউনলোর ঘরে ধ
আনা হয়েছে। ঘরের মধ্যে সে এখন সাময়িকভাবে নজরবন্দী
তার এই অবস্থা দেখে বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল—রাস্তা থেে
এরকম করে আমায় ধরে আনবার মানে কি ?

মিষ্টার ব্রাউনলো উত্তর করলেন—ধরে আনবার মানে আে
বৈকি। তোমায় পুলিসে দিতে পারতাম, কিন্তু তার আগে য
আমার কথায় রাজী হও ত রেহাই পাবে।

মঙ্কস্ কটমটিয়ে তাকিয়ে নিরুত্তর রইল।

মিষ্টার ব্রাউনলো আবার বললেন—তুমি শীগ্‌গীর ঠিক ক
ফেল মঙ্কস্, বিলম্ব করলে হয়ত সত্যিই তোমায় পুলিশের হা
তুলে দেব। আমার প্রিয়জনের স্বার্থের খাতিরেই আমায় এরক
করতে হ'চ্ছে।

মঙ্কস্ এবার ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটা চেয়া
থপ্ করে বসে পড়ল।

মিষ্টার ব্রাউনলো তখন তাঁর লোকজনকে বললেন—তোম
এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি ডাকবামাত্র তোম
আসবে।

মঙ্কস্ এবার বলে উঠল—আমার পিতৃবন্ধুর কাছ থেকে আমি ৎকার ব্যবহার পাচ্ছি।

মিষ্টার ব্রাউনলো তখন গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন—তোমার বার বন্ধু বলেই—তাঁর সঙ্গে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অনেক সুখ-দুঃখ সি-কান্নার ভেতর দিয়ে সময় কেটেছে বলেই আজ মনুষ্যত্বের তিরে তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে হচ্ছে—এড্ওয়ার্ড্ ফোর্ড্, তোমার সে জন্যে লজ্জা পাওয়া উচিত। ঐ নামের ি এতটুকু যোগ্য নও।

মঙ্কস্ যেন চমকে উঠে শুধোলে—ও নামের সঙ্গে আমার কি ম্পর্ক আছে ?

—সম্পর্ক হয়ত আজ আর কিছু নেই। ভালই হয়েছে য তুমি ওটা পালটে ফেলেছো। কিন্তু অনেকদিন আগেকার থা মনে পড়ে যায়, অনেক দিনের স্মৃতি।

ও এবার বললে—আমাকে এখানে নিয়ে এসে আপনি কি রতে চান ?

—তোমার একজন ভাই আছে জান, যার নাম শুনেই তুমি য়ে ভয়ে সুড়্সুড়্ করে এখানে এসেছ ?

—না, আমার কোন ভাই নেই। আপনি ত জানেন আমি পিতার একমাত্র পুত্র, তবে কেন ওরকম বলছেন ?

মিষ্টার ব্রাউনলো এবার ধমকে বললেন—এখনো না জানার ণ করছ ? আচ্ছা আমিই তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তুমি না যে তোমার বাবার দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না, ফলে

তিনি একত্রিশ বছর বয়সে, যখন তুমি মাত্র এগারো বছরের ছেলে, তখন আর একবার বিবাহ করেন—তাতে তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

মঙ্কস্ এবার ঠোঁট্ কামড়ে বলে উঠল—আপনার যা খুসী আপনি বলতে পারেন।

—তা ত বটেই, এ গল্প বোধহয় তোমার ভাল লাগছে না। যাইহোক্ শোন—কিছুদিন পরে তোমার বাবাকে কার্য্যোপলক্ষে রোমে যেতে হয়, সেখানে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। খবর পেয়েই তোমার মা তোমায় নিয়ে সেখানে ঠিক তাঁর মৃত্যুর সময় গিয়ে উপস্থিত হ'ন! তারপর কোন উইল না থাকার দরুণ তোমরা একাই তাঁর সম্পত্তি ভোগ করে আসছ।

এটুকু শুনেই মঙ্কস্ আবার ঠোঁট কামড়ে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লে।

মিষ্টার ব্রাউনলো বলে চললেন—বিদেশ যাবার আগেই তোমার বাবা আমার কাছে এসেছিলেন। যাবার সময় অনেক কিছু বলার পর তিনি একখানা ফটো দিয়ে গেছলেন—ফটোখানা হ'ল তাঁর নতুন স্ত্রীর, তাড়াতাড়িতে তাঁকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি, তোমার বাবার মনের অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না, বলেছিলেন ফিরে এসে তিনি আমায় সমস্তই জানাবেন। কিন্তু আর তিনি ফিরে আসেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি তাঁর নতুন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু গিয়ে শুনলাম অশেষ কে পড়ে তিনি সেখান থেকে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না।

মঙ্কস্ এবার যেন একটু টেনে-আনা হাসি হেসে তাঁর পানে
াকালে।

মিষ্টার ব্রাউনলো জানালেন—তারপর বহুদিন গত হ'লে
ামার ভাইকে একটা অনাথ ছেলে হিসেবে দৈব পরিক্রমায় যখন
স্তায় পেলাম, বাঁচালাম যখন তাকে পাপের পথ থেকে—

মঙ্কস্ কথার মাঝখানেই চেঁচিয়ে উঠল—কি বললেন?

—আমিই তাকে বাঁচিয়েছিলাম, তার ঐ রোগকাতর মুখের
কে চেয়ে আর আমার কাছে যে ফটোখানা ছিল সেটার সঙ্গে
লিয়ে দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে এ হয়ত আমার
পন কেউ হ'বে। তারপর তার নিকট হ'তে সমস্ত ইতিহাস
ানবার আগেই কি করে সে এখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিলো সে
থা তোমায় বলতে হবে না বোধ করি!

—কেন?

—কারণ তা' তুমি ভালই জান।

—আমি! আমি জানবো? মোটেই না।

—দেখ, আমার কাছে কিছু লুকানো বৃথা। আমি যা জানি
ার চেয়ে বেশী কিছু তোমায় দেখাতে পারি।

—আমি আপনাকে ভয় করি না, আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ
াই।

—প্রমাণ আছে, নিশ্চয়ই প্রমাণ আছে। তুমি এই ভাইয়ের
। জেনে তার জন্মস্থানে গিয়ে সে প্রমাণ নিজ হাতে নষ্ট
াছো। তুমি কি নিজ মুখে বুড়ো ইহুদিকে বলো নি যে

"ছেলেটার পরিচয়ের একমাত্র প্রমাণ আমি নদীগর্ভে নিক্ষে করেছি ?" অযোগ্য পুত্র, ভীরু, মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, চোরে সঙ্গে তোমার আড্ডা—এড্ওয়ার্ড লিফোর্ড নামের, তুমি কলঙ্ক।

মঙ্কস্ চেঁচিয়ে উঠল—না—না, কিছুতেই নয়।

—মিথ্যাবাদী কোথাকার! তোমার সমস্ত বিষয় জানি এখনো কি তুমি সত্য লুকোতে চাও ?

মঙ্কস্ এবার নিরুপায়ে বলে উঠল—না।

—তাহলে সাক্ষীর সামনে তোমার জবানবন্দী লিখে দাও।

—আচ্ছা আমি স্বীকার করছি দেব।

—স্বীকার নয়, এখনি লিখে দিতে হ'বে এবং আমি যা' বলি তাই করতে হ'বে।

—আচ্ছা তাই হ'বে।

—শুধু তাই নয়, তোমার ভাইয়ের যোগ্য অংশ তাকে দিে তুমি যেখানে খুসী চলে যাও, আমাদের কাছে তুমি আর মু দেখিও না।

ভয়ে, আশঙ্কায়, উদ্বেগে মঙ্কস্ যখন কি করা যায় ভাবছি ঠিক সেই সময় এক ভদ্রলোক—রোজেদের সেই ডাক্তার, ঝড়ে মত ঘরে ঢুকে বললেন—লোকটা ধরা পড়বে—আজ রাত্রেই বো হয় ধরা পড়বে।

—কে? নান্সীর হত্যাকারী ?

—হ্যাঁ। সে বেটা পালিয়েছিল, কিন্তু গোয়েন্দা লাগে

তার সম্বন্ধে কিছু সন্ধান পাওয়া গেছে। গভর্মেণ্ট্ থেকেও তাকে ধরার দরুণ একশো পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

মিঃ ব্রাউনলো উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলেন—আমি আরো পঞ্চাশ দেব। কিন্তু সেই বেটা ইহুদি ফ্যাগিনের কি হ'লো ?

-সেও শীগ্‌গীর ধরা পড়বে।

—কুড়ি—

ব্যবস্থার সমস্তই ঠিক। একটা বড় ঘরে সবাই সমবেত হ'য়েছেন। অলিভার আছে, রোজ ও তার খুড়ীমা আছেন, মিষ্টার ব্রাউনলো, মঙ্কস্, গ্রিম্‌উইগ, ডাক্তারবাবু প্রভৃতি সবাই হাজির ব্রাউনলো মশাই একখানা কি লেখা কাগজ নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে বললেন—সমস্তই লেখা হ'য়ে গেছে, এবার ওর নিজের মুখ থেকে আপনারা সব শুনুন। তারপর অলিভারকে দেখিয়ে মঙ্কস্‌কে শুধোলেন—ও হ'ল তোমার বৈমাত্রেয় ভাই, নয়?

মঙ্কস্ ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

অলিভার সমস্ত দেখে শুনে একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।

মিঃ ব্রাউনলো আবার বললেন—ও বাবা একখানা উইল করেছিলেন। তাতে তিনি প্রথমা স্ত্রীর ..ত বিরক্ত হ'য়ে মাত্র তার সন্তানের জন্য মাসহারার বন্দোবস্ত করে দেন। বাদবাকী সমস্ত সম্পত্তি তিনি দু' ভাগে ভাগ করে প্রথম অংশ দ্বিতীয়া স্ত্রীর নামে ও দ্বিতীয় অংশ তাদের সন্তানের নামে লিখে দেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হয়নি, কেন না, মঙ্কসের মা সেখানা তাঁর মৃত্যুর পরই পুড়িয়ে ফেলেছিল।

মঙ্কস্ কোন প্রতিবাদ করলে না।

মিষ্টার ব্রাউনলো পুনরায় আরম্ভ করলেন—কিন্তু ওর বৈমাত্রেয়

ইয়ের সন্ধান পেয়ে ও ভাবলে যে ভবিষ্যতে হয়ত তার সম্পত্তি হাত হ'তে পারে। তাই জোচ্চোর ফ্যাগিন্‌কে দিয়ে ও লিভারকে সরিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত করে, কিন্তু ও কৃতকার্য্য তে পারেনি। অলিভারকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবুও ওর পের দেওয়া 'এ্যাগ্‌নিস্' এই কথা ক্ষোদিত লকেট ও আংটি ও দীগর্ভে নিমজ্জিত করেছে, ভেবেছিল যে এতেই ওর পাপের থের সকল কণ্টক দূর হ'ল।

খানিকক্ষণ একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল, সকলেই মন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

মিষ্টার ব্রাউনলো [illegible] র হাত ধরে টেনে বললেন—জ মা, এধারে এস ত!

—আমায় আবার কেন [illegible], আমারও কি কোন আশ্চর্য্য তিহাসে উদ্ঘাটিত হ'বে?

—তাই যদি হয় মা, [illegible] কি?

—না, আজ আমি [illegible] করতে পারব না। সমস্ত দেখে ন আজ আমার কেমন যেন [illegible] তা বোধ হচ্ছে।

—কিছু ভয় নেই মা। এই [illegible] ল তিনি মঙ্ক্‌সকে শুধোলেন—ক চেন মঙ্ক্‌স্?

—হ্যাঁ।

রোজ্‌ উত্তর করলে—আমি [illegible] ওকে চিনি না।

মঙ্ক্‌স্ জানালে—তা হ'লেও আমি তোমায় অনেকবার দেখেছি।

মিষ্টার ব্রাউনলো তখন স[illegible]কে সম্বোধন করে বললেন—ঐ

হতভাগ্য এ্যাগ্নিসের পিতার দুই কন্যা ছিল, তার মধ্যে এ্যাগ্নিস হ'ল বড়। ছোটটির কি হয়েছিল মঙ্কস্?

—যখন ওর বাপ এক অদ্ভুত অজানা জায়গায় কোন এতটুকু পরিচয়-পত্র না রেখে মারা যায়, আর ওদের আত্মীয়-স্বজনদের যখন কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, তখন নিকটবর্ত্তী এক কুটিরবাসী ছোট মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে সন্তান নির্ব্বিশেষে মানুষ করে।

এইটুকু বলে মঙ্কস্ থামতেই মিষ্টার ব্রাউনলো জানালেন· থামলে কেন? বলে যাও।

মঙ্কস্ আরম্ভ করলে—কিছুদিন পরে আমার মা সেখা বেড়াতে গিয়ে এ তথ্যটি টের পান। তিনি তাদের জানান যে এর বোন বড় খারাপ মেয়ে মানুষ ছিল, সুতরাং এও বড় হ সেই রকম হ'বে। একে ত তারা গরীব, তার ওপর এই রক শুনে তারা মেয়েটার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'ল। দিনের পর দি মেয়েটার সেইখানে কষ্টের আর অবধি রইল না, কিন্তু হঠাৎ এক-দিন এক বিধবা সেখানে মেয়েটাকে দেখে তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে নিয়ে যান। সেখানে সে সুখেই ছিল, বছর তিনেক আমি তাকে আর দেখিনি, তারপর এই ক'মাস হ'ল আমি আবার তাকে দেখছি।

—তুমি কি এখন তাকে দেখতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ, ঐ যে ওই রোজ্।

রোজের খুড়িমা—সেই বিধবা তখন রোজকে আলিঙ্গন করে বললেন—ও আমার মেয়ের মত, ওকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না

রোজও তাঁকে আঁকড়ে ধরে জানালে—জগতে আমার সব চেয়ে
ড় আত্মীয় এঁর মত আর কে আছে!

অলিভার তখন রোজের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে—
তুমি আমার মাসীমা হ'লেও আমি তোমায় কখ্খনো মাসীমা বলব
না। তুমি আমার দিদি, আজ আমি দিদি পেয়েছি।

আবার একটা নিস্তব্ধতা, আনন্দের অশ্রুর বন্যা, সবাই যেন
নব ফিরে পেয়েছে। বহুদিনের কোন হারিয়ে যাওয়া জিনিষ
যেন আবার হাতে এল। এর পুলক অবর্ণনীয়। অলিভার মিষ্টার
ব্রাউনলোর কাছে থেকেই মানুষ হ'তে লাগল, তিনি তাকে নিজের
ছেলের চেয়েও বেশী করে দেখেন। রোজেরা সুখেই আছে। ঐ
বিধবার একমাত্র ছেলে হ্যারীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। অলিভার
মাঝে মাঝে দিদির কাছে বেড়িয়ে আসে।

ফ্যাগিনের বিচারের দিন।

আদালত-গৃহে অসম্ভব জনতা। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য,
সবার দৃষ্টি ঐ একটী লোকের ওপর নিপতিত।

ফ্যাগিন্ কিন্তু নীরব, নিশ্চল। তার মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন
মাত্র নেই। সে একবার করে আশে-পাশে লোকের দিকে তাকায়,
আবার আপন মনে কী যেন ভাবে।

অবশেষে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করলে, জুরীরা তাঁদের
মন্তব্য জানাতে ফিরে এলেন। তাঁদের সকলের অভিমত যে সে
পূর্ণ দোষী।

আদালত-গৃহের সমস্ত নরনারী একযোগে উল্লাসধ্বনি ক[illegible] উঠল। জজ সাহেব কালো টুপি পরে এসে জানিয়ে দিলেন যে তাকে সোমবারে ফাঁসী দেওয়া হবে। আদেশ শুনে এবারও সে এতটুকু বিচলিত হ'ল না, যেন সে একেবারে পাথর হয়ে গেছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে মোটেই কিছু শুনতে পায় নি।

জেলের কর্ম্মচারী তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে নিয়ে চলল। অবশেষে তাকে গারদে পুরলে। অন্ধকার! অন্ধকার! সেখানে কিছুই দেখা যায় না। অন্ত [illegible] লোকই ত এখানে তাদের শেষ নিঃশ্ [illegible] আগে একবিন্দু আলো তারা পায় না।

ক্রমে রাত্রি নেমে এল, অন্ধকার, বিভীষিকাপূর্ণ, নিস্তব্ধ রজনী। প্রহর কাটে। গীর্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে টহলদারদের উল্লাস আসে, তাদের পালা শেষ হয়। কিন্তু ফ্যাগিনের কাছে ঐ ঘণ্টার রিন্‌রিনে আওয়াজ যেন মৃত্যুর ডাকের মত বো[illegible] হয়। এই রকম করেই আবার দিন আসে, আবার যা[illegible] ফ্যাগিন্ এবার যেন পাগলের মত হয়ে গেছে। আপন ম[illegible] কখনো বা সে চীৎকার করে ওঠে, কখনো বা দু'হাতে নিজে[illegible] মাথার চুল ছেঁড়ে। প্রার্থনা করবার জন্যে পাদ্রী এসেছিল, কি[illegible] সে তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। বিধাতার প্রতি তা[illegible] এখন দারুণ বিতৃষ্ণা।

ফাঁসীর আগের রাত্রি! এই একটা রাত্রিই সে আর পৃথিবী[illegible] বাঁচবে, এতটুকুই তার মেয়াদ। কেমন একপ্রকার উত্তেজন[illegible]

সে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে। আপন [illegible] সে ঐ ছোট্ট গারদের মধ্যে ছুটোছুটি করছে আর চেঁচাচ্ছে। মুখ তার পাণ্ডুর, বিবর্ণ ও ভীতিগ্রস্ত, রুক্ষ চুল মুখের দু'পাশে ঝুলে পড়ে তাকে ভীষণাকৃতি করে তুলেছে। মরবার পূর্ব্বে কেউই তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, তেমন আশাও বা সে কার কাছ থেকে করবে! কিন্তু তাকে আশ্চর্য্য করে জেলের কর্ম্মচারী এসে জানালে যে দু'জন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ও ভেবে [illegible]

[illegible] মঙ্ক? চীৎকার করে উঠল—কে? সাইক্স্! [illegible]-হাঃ-হাঃ! তার ফাঁসী? সে তো আগেই হয়ে গেছে। আমি [illegible] তার [illegible]।

কর্ম্মচারীটি এবার তার ভাব-ভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে জানালে—একজন বুড়ো গোছের ভদ্রলোক—।

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার ব্রাউনলো অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

তাদের দেখেই সে এক কোণে সরে গিয়ে বলে উঠল—কি চাই? আমাকে এখানে মারতে আসবার ওদের কী অধিকার আছে?

মিষ্টার ব্রাউনলো তখন বললো—তোমায় মারতে আসিনি ফ্যাগিন্। তোমার কাছে মঙ্কস্ কতকগুলো কাগজপত্র রেখেছিল—

কথা শেষ না হতেই সে চীৎকার করে উঠল—না-না, আমার কাছে কিছু নেই, তোমরা যাও, চলে যাও!

—ভগবানের দোহাই ফ্যাগিন্, এখন আর মিথ্যে কথা বোলো না! তুমি জানো সাইক্স্ পালাতে গিয়ে গলায় ফাঁস লট্‌কে মরেছে, মঙ্কস্‌ও স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এখন আর মিথ্যে ব'লে তোমার কী লাভ হ'বে! ব'ল সেগুলো কোথায়?

ফ্যাগিন্ এই কথাগুলো শুনে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে খানিকটা তাকিয়ে কি যেন ভাবলে। তারপর অলিভারের দিকে চেয়ে বললে—আমাদের সামনের ঘরের চিম্‌নীর ধারের গর্ত্তের ভেতর আছে।

ওরা দুজনে তখন বলে উঠল—ভগবান তোমায় ক্ষমা করুন।

ও পাগলের মত আবার আওড়াতে লাগল—[illegible] হাঃ-হাঃ-হাঃ ফাঁসীমঞ্চে ওঠবার সময় আমি যদি কেঁপে [illegible] তাহ'লেও—তাইত'—

কুঠরীর দরজা বাইরে থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ও আবার চীৎকার করে উঠল—বন্ধ কর, বন্ধ কর, জোরে আরও জোরে। আর তার সেই আর্ত্তনাদ নিস্তব্ধ নিশীথে সারা জেলখানার মধ্যে আছড়ে পড়ে যেন কোন্ মৃত্যুর কালো দূতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল।

—শেষ—